তিন গোয়েন্দা - ছায়াশ্বাপদ

ভলিউম ১

ছায়াশ্বাপদ

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৮৬

০১.

শেষ ডিসেম্বরের এক হিমেল সন্ধ্যা।প্যাসিও প্লেসে।এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা।হেঁটে যাচ্ছে একটা পার্কের পাশ দিয়ে।এই শীতেও মৌসুমের শেষ কয়েকটা গোলাপ ফুটে আছে।পার্কের পাশে একটা আস্তরবিহীন লাল ইটের বাড়ি, সেইন্ট জুডস রেকটরি-গির্জার যাজকদের বাসভবন।রেকটরির ওপাশে ছোট্ট গির্জা, ঘষা-কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো আসছে।ভেতরে বাজছে অর্গান, কখনও উঁচু পর্দায়।কখনও একেবারে খাদে নেমে যাচ্ছে সুর।অর্গানের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বাচ্চা।ছেলেমেয়েদের গলা, তালে তালে সুর করে পবিত্র শ্লোক আওড়াচ্ছে কবিতার মত।

রেকটরি আর গির্জার পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ছিমছাম নীরব একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা, একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস।বাড়িটার একপাশে রাস্তার সমতলে কয়েকটা গ্যারেজ।দ্বিতল বাড়ি, প্রতিটি জানালায় পর্দা, বদ্ধ কাঁচের শার্সি।বাইরের জগৎ থেকে নিজেদেরকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে যেন।ভাড়াটেরা।

এটাই, বলল কিশোর পাশা, তিনশো তেরো নাম্বার, প্যাসিও প্লেস।এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা।একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি।

গ্যারেজগুলোর ডানে পাথরের চওড়া সিঁড়ি, গেটের কাছে উঠে শেষ হয়েছে।সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল খাকি রঙের জ্যাকেট পরা একটা লোক।তিন গোয়েন্দার দিকে তাকালও না, পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সিঁড়িতে পা রাখল কিশোর।উঠতে শুরু করল।ঠিক পেছনেই রয়েছে মুসা আর রবিন।

হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল মুসা।লাফিয়ে সরে গেল একপাশে।

থেমে গেল কিশোর।চোখের কোণ দিয়ে দেখল, প্রায় উড়ে নিচে নেমে যাচ্ছে একটা কালো কিছু।

বেড়াল, সহজ গলায় বলল রবিন।

প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিলাম! কেঁপে উঠল মুসা।দুপাশ থেকে স্কি-জ্যাকেটের দুই প্রান্ত টেনে এনে চেন তুলে দিল।কালো বেড়াল!

হেসে ফেলল রবিন।তাতে কি? কুলক্ষণ ভাবছ নাকি?...এস।

গেটের খিলের দিকে হাত বাড়াল কিশোর।ওপাশে পাথরের বিরাট চত্বর।মাঝখানে বড় একটা সুইমিং পুল, ওটা ঘিরে লোহার চেয়ার-টেবিল সাজানো। চত্বরের চারপাশে লতাগুল্মের ঝাড়।

গেট খুলল কিশোর।এই সময় জ্বলে উঠল ফ্লাডলাইট, সুইমিং পুলের ভেতরে, লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে।

এখানে কি চাই! কিশোরের প্রায় কানের কাছে কথা বলে উঠল খসখসে নাকী একটা গলা।

গেটের পাশেই বাড়ির একটা দরজা খুলে গেছে।দাঁড়িয়ে আছে এক মোটাসোটা মহিলা। লাল চুল।রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দার দিকে।

ম্যাগাজিন বিক্রি করতে এসেছ? আবার বলল মহিলা, চকলেট? নাকি সাহায্য চাইতে এসেছ ক্যানারি পাখির এতিম বাচ্চার জন্যে? তা যে-জন্যেই এসে থাক, বিদেয় হও। আমার ভাড়াটেদের বিরক্ত করা চলবে না।

মিসেস ডেনভার!

ডাক শুনে ফিরে তাকাল মহিলা।চত্বরের দিকে মুখ-করা একটা ব্যালকনি থেকে নেমে এসেছে সিঁড়ি।সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ।মনে হয়, ওরাই আমার লোক।

আমি কিশোর পাশা, বলল গোয়েন্দাপ্রধান।বয়েসের তুলনায় ভারিক্কি গলা, ভাবভঙ্গি। অপরিচিত কারও সঙ্গে এভাবেই কথা বলে সে।সমান্য পাশে সরে দুই সহকারীকে দেখিয়ে বলল, মুসা আমান, রবিন মিলফোর্ড।আপনিই মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক অলিভার?

হ্যাঁ, বললেন বৃদ্ধ।দরজায় দাঁড়ানো মহিলার দিকে তাকালেন।আপনাকে দরকার নেই, মিসেস ডেনভার।

বেশ! রাগ প্রকাশ পেল মহিলার গলায়।গটমট করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

নাকা বুড়ি, বিড়বিড় করলেন ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।ওর ব্যবহারে কিছু মনে।কোরো না।ভেবে বোসো না, এ-বাড়ির সবাই এমনি।তা নয়।আর সবাই খুব ভাল।এস।

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে ব্যালকনিতে উঠে এল তিন গোয়েন্দা।কয়েক ফুট দূরে দরজা।তালা খুললেন মিস্টার অলিভার।ছেলেদেরকে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে।ছাতের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে পুরানো আমলের বড় দামি ঝাড়বাতি।টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা কৃত্রিম ক্রিসমাস গাছ, চমৎকার করে সাজানো।

বস, কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন মিস্টার অলিভার।দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন।

ঠিক সময়ে এসেছ, বললেন বৃদ্ধ, ভাল।আর কোন কাজ নেই তো।তোমাদের? মানে, ক্রিসমাস সপ্তাটা কাটানর জন্যে অন্য কোন প্ল্যান নেই তো?

কাজ আছে, তবে সময় বের করে নিতে পারব আমরা, ভারিক্কি ভাবটা বজায় রাখল কিশোর। স্কুল খুলবে আগামী হপ্তায়। তার আগেই বেশ কিছু কাজ সেরে নিতে হবে। আপনাকে সময় দিতে পারব।

কষ্ট করে হাসি চাপল মুসা।কি কাজ, খুব ভালই জানা আছে তার।কয়েকদিন ধরেই মেরিচাচী খুব খাঁটিয়ে মারছেন তিনজনকে, লোভনীয় পারিশ্রমিক দিচ্ছেন।অবশ্যই।কিন্তু ওই একঘেয়ে কাজ আর ভাল লাগছে না তিন গোয়েন্দার।অথচ এমনভাবে বলছে কিশোর, যেন কি সাংঘাতিক জরুরি কাজ পড়ে আছে! নিজেদের দাম বাড়াচ্ছে আসলে।

তো, আবার বলল কিশোর, কি জন্যে ডেকেছেন? শুনি আগে সব, তারপর বলতে পারব, আমাদের দিয়ে সাহায্য হবে কি না।

হবে কিনা! কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন অলিভার।হতেই হবে।মানে, সাহায্য করতেই হবে আমাকে।এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।হঠাৎ কেঁপে উঠল তার গলা, তীক্ষ্ণ হয়ে এল।এখানে যা ঘটছে, আর সওয়া যাচ্ছে না!

চুপ করলেন অলিভার।উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।শান্ত করার চেষ্টা করছেন।নিজেকে।তোমরা তিন গোয়েন্দা, না? এটা তোমাদের কার্ড? ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরলেন।তাতে লেখা:

তিন		গোয়েন্দা
প্রধান:	কিশোর	পাশা
সহকারী:	মুসা	আমান
নথিরক্ষক ও গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড		

কার্ডটার দিকে একবার চেয়েই মাথা ঝোকাল কিশোর।

ডেভিস দিয়েছে আমাকে কার্ডটা, বললেন অলিভার।চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার।আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে।বলেছে, তোমরা গোয়েন্দা।বিশেষ করে, অদ্ভুত রহস্যের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ নাকি বেশি?

ঠিক, স্বীকার করল কিশোর।প্রশ্নবোধকগুলো সেজন্যেই বসিয়েছি।যতরকম আজব, উদ্ভট, অস্বাভাবিক রহস্য ভেদ করতে আগ্রহী আমরা।কয়েকটা রহস্যের সমাধানও করেছি।তো, আপনার অসুবিধেটা কি? না শুনে বলতে পারছি না, সাহায্য করতে পারব কিনা।তবে চেষ্টা অবশ্যই করব।ইতিমধ্যেই আপনার সম্পর্কে কিছু কিছু খোঁজখবর করেছি।আপনি কে, কি, জানা হয়ে গেছে আমাদের।

কি? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছ?

নিশ্চয়।মক্কেলের ব্যাপারে খোঁজ নেব না? আপনি কি বলেন? পাল্টা প্রশ্ন।করে বসল কিশোর।

আড়ালে থাকতেই পছন্দ করি আমি, বললেন বৃদ্ধ।লোকের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ভাল লাগে না।

পুরোপুরি আড়ালে কেউই থাকতে পারে না রবিনকে দেখিয়ে বলল কিশোর।কাগজপত্র ঘেঁটে লোকের পরিচয় বের কব্রার ব্যাপারে ওর তুলনা নেই।রবিন, মিস্টার অলিভারকে বল কি কি জেনেছ।

হাসল রবিন। লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে বটে কিশোর। মনে মনে বন্ধুর প্রতি আরেকবার শ্রদ্ধা জানাল গবেষক।পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই বের করে খুলল।লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্য আপনার, মিস্টার অলিভার বয়স সত্তর চলছে।আপনার বাবা, মিস্টার হারল্ড অলিভার, বিরাট বড়লোক ছিলেন।অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন, আপনার নামে। বাপের সম্পত্তি নষ্ট করেননি আপনি, বহাল রেখেছেন ঠিকমতই।চিরকুমার রয়ে গেছেন। এমণে প্রচণ্ড নেশা, শিল্পের প্রতি বেজায় ঝোঁক। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন মিউজিয়ম আর দরিদ্র শিল্পীদের দান-খয়রাত করেন। শিল্পের সমঝদার বলে আখ্যায়িত করেছে আপনাকে খবরের কাগজগুলো।

বড় বেশি বাড়িয়ে লেখে ব্যাটারা, গজগজ করলেন অলিভার।সেজন্যেই খবরের কাগজ নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।

কিন্তু ওরা আপনাকে নিয়ে ঘামায়, বলল কিশোর।তবে, খুব বেশি বাড়িয়ে লিখেছে বলে তো মনে হয় না।ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে রাখা শিল্পকর্মগুলো দেখাল সে।

বেশ বড়সড় একটা শো-কেস রয়েছে ঘরের এক প্রান্তে। তাতে নানারকম দামি সংগ্রহ। তাছাড়া দেয়ালে ঝুলছে চমৎকার সব চিত্র, টেবিলে চীনামাটির তৈরি অসংখ্য মূর্তি।এখানে ওখানে কায়দা করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটা প্রদীপ, নিশ্চয় ইংল্যাণ্ডের মূরদের কোন প্রাসাদ থেকে এসেছে।

ওসব কথা থাক, বললেন অলিভার।সুন্দর জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ।থাকেই, এর জন্যে অতিমানব হওয়ার দরকার পড়ে না।কিন্তু এখানে যা ঘটছে, ওসবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

– কি ঘটছে? জানতে চাইল কিশোর।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালেন মিস্টার অলিভার।পাশের ঘরে তাঁর কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে, আশঙ্কা করছেন যেন।ফিসফিস করে বললেন, ভূতের চোখ পড়েছে আমার ওপর!

একদৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা।

বিশ্বাস করতে পারছ না? আবার বললেন অলিভার, কিন্তু সত্যি বলছি, ভূতের চোখ পড়েছে।আমি বাইরে গেলেই কেউ একজন এসে ঢোকে এখানে।জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে।যেটা যেখানে রেখে যাই, ফিরে এসে আর সেখানে পাই না।একবার দেখলাম, ডেস্কের ড্রয়ার খোলা চিঠিপত্র অগোছাল। অনেক বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আপনার, বলল কিশোর।ম্যানেজার নেই? নিশ্চয় মাস্টার কী রয়েছে তার কাছে?

নাক কোচকালেন অলিভার। ওই নাকা বুড়িটাই আমার ম্যানেজার। তবে চাবি নেই ওর কাছে। তাছাড়া আমার ঘরে বিশেষ তালা লাগিয়েছি। কোন চাকর-বাকর নেই। জানালা দিয়ে ঢোকে না কেউ, আমি শিওর। জানালা খোলা রেখে কখনও বেরোই না। আর খোলা রাখলেও ঢোকা সহজ না। রাস্তা থেকে বিশ ফুট ওপরে। রয়েছে ওগুলো। উঠতে হলে উঁচু মই দরকার। এবং সেটা করতে গেলে লোকের চোখে পড়ে যাবেই সে।

হয়ত বাড়তি চাবি আছে কারও কাছে, বলল মুসা। আপনি বেরিয়ে গেলেই তালা খুলে–

হাত তুললেন অলিভার। না না, সেটা নয়। আগে শোন সবটা। বেরিয়ে গেলেই যে শুধু ঢোকে, তা নয়। পুরো ঘরে চোখ বোলালেন তিনি, নিশ্চিত হয়ে নিলেন ছেলেরা ছাড়া আর কেউ নেই। কখনও-কখনও আমি ঘরে থাকলেও সে ঢোকে। আমি–আমি–দেখেছি।–ও আসে, যায়, দরজা খোলার দরকারই পড়ে

কেমন দেখতে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

তালুতে তালু ডলছেন অলিভার। অস্বস্তি বোধ করছেন, বোঝা যাচ্ছে। পুলিশকে বললে তারাও এ প্রশ্নই করত, মুখ তুললেন। তবে, আমার জবাব। বিশ্বাস করত না তারা। সেজন্যেই তাদেরকে ডাকিনি, তোমাদেরকে ডেকেছি। আমি যাকে দেখেছি–সে মানুষ নয়, মানুষের ছায়া বললেই ঠিক হবে। বসে হয়ত কখনও পড়ছি, হঠাৎ অনুভব করি তার অস্তিত্ব। চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাই। একবার দেখেছি হলঘরে। লম্বা, রোগা টিঙটিঙে। কথা বললাম। কোন জবাব দিল না। শেষে চেঁচিয়ে উঠলাম। ফিরেও তাকাল না। সোজা ঢুকে পড়ল আমার কাজের ঘরে। পেছন পেছন গেলাম। নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কাজের ঘরটা দেখতে পারি? বলল কিশোর।

নিশ্চয়। এস।

মিস্টার অলিভারের পেছন পেছন ছোট একটা হলঘরে এসে ঢুকল কিশোর। ওটা পেরিয়ে এসে ঢুকল বড় আরেকটা ঘরে। ম্লান আলো জ্বলছে। অসংখ্য বুকশেলফ বইয়ে ঠাসা। বড় একটা পুরানো আমলের টেবিল। কয়েকটা চামড়া মোড়া পুরু গদিটাকা চেয়ার। ঘরের এক প্রান্তের দেয়ালে কয়েকটা জানালা, ওটা বাড়ির পেছন দিক। পর্দা ফাঁক করে তাকাল কিশোর। কাছেই গির্জাটা। অর্গান থেমে গেছে, ছেলেমেয়েদের গলাও কানে আসছে না আর। বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয়।

হলঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া এ ঘর থেকে বেরোনর আর কোন দরজা নেই, বললেন অলিভার। কোনরকম গোপন প্রবেশ পথ নেই। বহু বছর ধরে আছি এ বাড়িতে, তেমন কোন পথ থাকলে আমার অন্তত অজানা থাকত না।

কতদিন ধরে ঘটছে এটা? প্রশ্ন করল কিশোর। এই যে ছায়ার উপস্থিতি?

কয়েক মাস। প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইনি। ভেবেছি, ওসব আমার কল্পনা। কিন্তু আজকাল এত বেশি ঘটছে, আর ওটাকে কল্পনা বলে মেনে নিতে পারছি না।

অলিভারের দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ছায়ার উপস্থিতি সত্যিই বিশ্বাস করছেন বৃদ্ধ। অনেক অদ্ভুত ঘটনাই ঘটে এ-পৃথিবীতে! আপনমনেই বিড়বিড় করল গোয়েন্দাপ্রধান।

তাহলে কেসটা নিচ্ছ? হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন অলিভার।তদন্ত করছ এ ব্যাপারে?

অ্যাঁ! চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর।ও হ্যাঁ–আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।এখুনি কোন কথা দিতে পারছি না।আগামীকাল সকালে।জানাব আপনাকে।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন বৃদ্ধ।এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।বেরিয়ে গেলেন।

এগোতে গিয়েও দ্বিধা করল কিশোর।পা বাড়িয়ে থেমে গেল হঠাৎ।ঘরের ছায়াঢাকা কোণে একটা বুকশেলফের পাশে নড়ে উঠেছে কিছু!

হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোর।মুসা!

আমাকে ডাকছ? হলঘর থেকে মুসার কথা শোনা গেল।

মুসা! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।লাফ দিয়ে এগোল সুইচবোর্ডের দিকে।

এক সেকেণ্ড পরেই মাথার ওপরে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো।অন্ধকার দূর হয়ে।গেল ঘর থেকে।দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মুসার কথা, কি হল?

তুমি-তুমি ওঘরে ছিলে, যখন আমি ডেকেছিলাম! প্রায় ফিসফিস করে বলল কিশোর।

হ্যাঁ।কেন? ভূত দেখেছ বলে মনে হচ্ছে?

মনে হল তোমাকে দেখলাম! আঙুল তুলে ঘরের কোণ দেখাল কিশোর।ওখানে।তুমিই যেন দাঁড়িয়েছিলে! জোরে জোরে মাথা নাড়ল।হয়ত চোখের ভুল! বুকশেলফের ছায়াই দেখেছি! বিমূঢ় মুসার পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে চলে এল

বসার ঘরে এসে ঢুকল কিশোর।আগামীকাল অবশ্যই যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।

ঠিক আছে, কিশোরের দিকে না চেয়েই বললেন মিস্টার অলিভার।দরজার তালা খুললেন। পাশে সরে ছেলেদেরকে বেরোনর জায়গা করে দিলেন।

হঠাই কানে এল তীক্ষ্ণ শব্দটা।গাড়ির ইঞ্জিনের মিসফায়ারের মত।গুলির শব্দ?

প্রায় লাফিয়ে দরজার কাছে চলে এল মুসা।ব্যালকনির রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে।দাঁড়াল। নিচে শূন্য চত্বর।বাড়িটার পেছনে শোনা যাচ্ছে লোকের চিৎকার।জোরে গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল, পাথরের কোন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে এখান থেকে।বাড়ির পাশের সরু একটা গলিপথ দিয়ে ছুটে চত্বরে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি। গায়ে কালো উইণ্ডব্রেকার, কালো স্কি-হুঁডে ঢাকা মাথা।সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামল।

সিঁড়িগুলো যেন উড়ে টপকালো মুসা।গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সবে পথে নেমেছে, সামনে এসে দাঁড়াল একজন পুলিশ।চত্বরের একপাশ ঘুরে বেরিয়ে এসেছে।

ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে! বলল পুলিশ।থাম এবার, দোস্ত।নইলে গুলি খাবে।

চত্বরের একই পাশ দিয়ে আরেকজন পুলিশ বেরিয়ে এল।ওর হাতেও রিভলভার।মুসা দেখল, দুটো নলই চেয়ে আছে ওর দিকে।পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে।ধীরে, অতি ধীরে মাথার ওপর তুলে আনছে দুই হাত।

.

০২.

ডিক, বলল প্রথম পুলিশটা, দুজনের মাঝে তার বয়েস কম।আমার মনে হয় ও না!

কালো উইণ্ডব্রেকার, হালকা রঙের ট্রাউজার! মুসার আপাদমস্তক দেখছে দ্বিতীয় পুলিশ। হয়ত স্কি-হুঁডটা খুলে ফেলে দিয়েছে!

ওই লোকটার কথা বলছেন? বলল মুসা।এদিক দিয়েই গেছে সে।গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছিল, আমি দেখেছি।

কিশোর আর রবিন পৌঁছে গেল।তাদের পেছনে দাঁড়ালেন মিস্টার অলিভার।

কাকে আটকেছেন আপনারা? হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন বৃদ্ধ।গত আধঘণ্টা ধরে আমার ঘরে ছিল ছেলেটা।

সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল।ছুটে আসছে পুলিশ পেট্রলকার।

এস, ডিক, বলল তরুণ পুলিশ অফিসার।খামোকা সময় নষ্ট করছি এখানে।দুঃখিত, মিস্টার অলিভার।

ছুট লাগাল আবার পুলিশ দুজন।ঠিক এই সময় খুলে গেল মিসেস ডেনভারের দরজা।

মিস্টার অলিভার, নাকী গলা শোনা গেল, কি অঘটন ঘটিয়েছে ছেলেগুলো?

চত্বরের ডানে আরেকটা ঘরের দরজা খুলে গেল।ছুটে বেরিয়ে এল এক তরুণ।চোখ ডলছে, সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে মনে হয়।ওর দিকে চেয়ে একটু যেন চমকে উঠল কিশোর।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করল রবিন।ফিসফিস করে বলল, কি ব্যাপার?

কিছু না, চাপা গলায় বলল কিশোর।পরে বলব।

মিস্টার অলিভার, ঝাঁঝ প্রকাশ পেল মিসেস ডেনভারের গলায়, আমার।কথার জবাব দেননি! কি করেছে?

– সেটা আপনার ব্যাপার নয়! ধমকে উঠলেন অলিভার।কথাটা বেশি কড়া হয়ে গেছে বুঝে স্বর নরম করলেন।ওরা কিছু করেনি।কাকে যেন খুঁজছে পুলিশ! বাড়ির পেছন থেকে এসে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে।ধাওয়া করে এসেছে পুলিশ!

চোর-ছ্যাচোড় হবে! পেছন থেকে বলে উঠল তরুণ।পরনে কালো সোয়েটার, হালকা বাদামি ট্রাউজার।পায়ে চপ্পল।

খুটিয়ে দেখছে ওকে কিশোর।রোগাপাতলা লোকটা, মাথায় কালো চুল, কতদিন আগে ধুয়েছে, কে জানে! তবে খুব শিগগির নয়।মুসার মতই লম্বা, তবে অনেক রোগা।

বাহ্, বেশ বুদ্ধি তো তোমার, টমি! মুখ বাঁকাল মিসেস ডেনভার।কি করে জানলে, চোর-ছাচোড়কে খুঁজছে পুলিশ?

অপ্রস্তুত হয়ে গেল টমি গিলবার্ট ঢোক গিলল।গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপরে উঠে আবার নেমে পড়ল কণ্ঠ।চোর-ছ্যাচোড় ছাড়া আর কে হবে?

ছড়িয়ে পড়! বড় রাস্তার দিক থেকে চিৎকার শোনা গেল।গলিপথগুলো আটকাও! গির্জার ভেতরে দেখ!

গোটা চারেক পেট্রলকার দেখা গেল রাস্তার মোড়ে।নাচানাচি করছে টর্চের আলো।প্রতিটি কোণ, গলিঘুপচি, ঝোঁপঝাড়ের ভেতর উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখছে।পুলিশ।প্রচণ্ড শব্দ তুলে মাথার ওপরে চলে এল একটা হেলিকপ্টার, ঘুরে ঘুরে চক্কর দিতে শুরু করল পুরো এলাকাটায়।সার্চলাইটের আলো ফেলে খুঁজছে লোকটাকে।পথে, বাড়ির দরজায় বেরিয়ে এসেছে কৌতূহলী লোকজন।

বেশি দূরে যেতে পারেনি, বলে উঠল একজন পুলিশ।নিশ্চয় এদিকেই কোথাও লুকিয়েছে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে মোটাসোটা একজন লোক। মাথায় ধূসর ঘন চুল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।এগিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গেটের দিকে।ফ্র্যাঙ্ক।ডাকল।লোকটা।ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।

এগিয়ে গেলেন অলিভার। তার হাত ধরল লোকটা। নিচু গলায় বলল কি যেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন অলিভার।ভুলেই গেছেন যেন ছেলেদের উপস্থিতি।

কিশোরকে খোঁচা লাগাল মুসা।চল, দেখি গির্জায় কি করছে পুলিশ!

অনেকেই এগিয়ে যাচ্ছে গির্জার দিকে।তিন গোয়েন্দাও এগোল।

ইতিমধ্যেই গির্জার চত্বরে ভিড় জমিয়েছে অনেক লোক, তাদের মাঝে মিসেস ডেনভারও আছে।খোলা দরজা দিয়ে সবাই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।ভেতরে খোঁজাখুজি করছে দুজন পুলিশ। কোথাও বাদ দিচ্ছে না ওরা।নুয়ে পড়ে বেঞ্চগুলোর তলায়ও দেখছে।

জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেল কিশোর।গির্জার সিঁড়ির দুটো ধাপ উঠল। তাকাল ভেতরে।বেদিতে জ্বলছে সারি সারি লাল নীল সবুজ মোমবাতি, খানিক আগে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার সাক্ষী।বেশ কিছু স্থির মূর্তি চোখে পড়ল তার।স্ট্যাচু।দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ছোট নিচু বেদিতে, মেঝেতে, ঘরের কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।একগাদা ছোট পুস্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটেখাট মোটা এক লোক, লাল মুখ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ সার্জেন্ট।

আমি বলছি, কেউ ঢোকেনি এখানে, বলল মোটা লোকটা।সারাক্ষণ এখানে ছিলাম আমি। কেউ ঢুকলে অবশ্যই দেখতে পেতাম।

তা হয়ত পেতেন, চেঁচিয়ে বলল সার্জেন্ট।দয়া করে বেরিয়ে যান এখন।ভাল করে খুঁজব আমরা।ফিরে তাকাল সে।কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই বলল, এখানে কি করছ, খোকা? যাও।

পুস্তিকা হাতে বেরিয়ে এল মোটা লোকটা।তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি থেকে নেমে পড়ল কিশোর।

জনতার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন এখন রোগাপাতলা, মাঝবয়েসী একজন লোক।গায়ে কালো আলখেল্লা, সাদা কলার, পাদ্রীর পোশাক।তার সঙ্গে রয়েছে।এক বেঁটে মহিলা। ধূসর চুল ঘাড়ের ওপর পরিচ্ছন্ন করে বাঁধা।পোশাকেই বোঝা যায়, গির্জায় কাজ করে।

ফাদার স্মিথ! চেঁচিয়ে উঠল পুস্তিকা-হাতে লোকটা।ওদেরকে বলুন আপনি।এ সারাক্ষণ গির্জায় ছিলাম আমি।আমার চোখ এড়িয়ে কারও পক্ষে ঢাকা সম্ভব ছিল না।

আহ, চুপ কর, পল! বিরক্ত গলায় বললেন ফাদার।খুঁজুক না ওরা, তোমার কি?

কি বললেন? কানের ওপর হাত রেখে ফাদারের দিকে চোখ ফেরাল পল।

খুঁজুক ওরা! চেঁচিয়ে বললেন ফাদার।কোথায় ছিলে তুমি?

চিলেকোঠায় উঠেছিলাম, পুস্তিকা পাড়তে।

তাহলে তো হয়েছেই! হেসে ফেলল ধূসর-চুল মহিলা।গির্জার ভেতরে হাজারখানেক হাতি ঢুকে দাপাদাপি করলেও ওখান থেকে শুনতে পাবে না তুমি।রোজই বলছি ডাক্তার দেখাও, কানের ব্যামো সারাতে পার কিনা দেখ।তবে দেখালেও সারবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জনতার ভেতর থেকে হেসে উঠল কেউ।

মিসেস ব্রাইস, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন পাদ্রী, ইচ্ছে করে কেউ বধির হতে চায় না। ওভাবে কারও সম্পর্কে কথা বলা উচিত নয়।এস, রেকটরিতে যাই।চা খেতে ইচ্ছে করছে। পল, তুমিও চল।পুলিশের খোঁজা শেষ হলে এসে দরজায় তালা লাগিও।এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই।

সরে পথ করে দিল জনতা।পাশের আস্তরবিহীন বাড়িটার দিকে চলে গেলেন ফাদার, পল আর ব্রাইস।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসল জনতার একজন।তোমরা কি এদিকেই কোথাও থাক? ফিরে এসেছে হেলিকপ্টার, প্রচণ্ড শব্দ।জোরে কথা বলতে হচ্ছে।লোকটাকে।

না, জবাব দিল রবিন।

তাহলে জান না, মজার সব লোক বাস করে ওখানে, রেকটরির দিকে ইঙ্গিত।করে বলল লোকটা।পল মিনের ধারণা, গির্জাটা সে-ই চালাচ্ছে।তামারা ব্রাইস মনে করে, সে না থাকলে বন্ধই হয়ে যেত গির্জা।অথচ একজন দারোয়ান, আরেকজন হাউসকিপার! ওদের দুজনকে সামলাতে হিমশিম খেয়ে যান ফাদার স্মিথ।

ঠিকই, লোকটার কথায় সায় দিল এক মহিলা।ফাদারকে জ্বালিয়ে মারে ওরা।আইরিশ মেয়েমানুষটা ভাবে, সে-ই গির্জার সব।আরও দোষ আছে ওর।প্রায়ই ভূত দেখে গির্জার ভেতরে।তার ধারণা, অন্ধকার জায়গা মানেই ভূতের আস্তানা।আর ওই দারোয়ানটা, পল, সে তো ভাবে, সে না থাকলে ধসেই পড়ে যেত গির্জাটা।

গির্জা থেকে কনস্টেবল দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট।চতুরে দাঁড়ানো।জনতার ওপর চোখ বোলাল একবার।এখানকার চার্জে রয়েছেন কে?

তিনি চা খেতে গেছেন রেকটরিতে, বলল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলছিল যে লোকটা। দাঁড়ান, ডেকে আনছি।

শেষবারের মত মাথার ওপর চক্কর দিয়ে গেল পুলিশ হেলিকপ্টার।চলে গেল উত্তরে।

মিস্টার অলিভার আর তার মোটা সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল লেফটেন্যান্ট, এগিয়ে এল।

গির্জার ভেতরে নেই, জানাল সার্জেন্ট।

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট।আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি পালাল কি করে? হেলিকপ্টারের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে গেল! নাহ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।আজ রাতে আর কিছুই করার নেই আমাদের, সার্জেন্ট।

প্রায় ছুটতে ছুটতে এল পল।ছুটে গেল গির্জার দিকে।দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

কয়েক মিনিট পর, পুলিশের গাড়িগুলো চলে গেল।একে একে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল জনতা।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দিকে চলল তিন গোয়েন্দা।গেটের কাছে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটার সঙ্গে এখনও কথা বলছেন মিস্টার অলিভার।

মিস্টার অলিভার, বলল কিলোর।আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলাম না

না না, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন অলিভার।তার সঙ্গীর দিকে কিশোরকে তাকাতে দেখে বললেন, ও, এ হল মিকো, মিকো ইলিয়ট।কি হয়েছিল, ওর কাছেই জানলাম।

আমার ভাইয়ের ঘরে চোর ঢুকেছিল, তিন গোয়েন্দাকে জানাল মিকো।লুকান কোর্টে তার বাসা।এই রাস্তার পরের রাস্তাটাই।

সত্যিই, মিকো, বললেন অলিভার।আমারই খারাপ লাগছে, তোমার তো লাগবেই।

লাগারই কথা, মাথা ঝোঁকাল মিকো।যাকগে, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই।যাই। সকালে দেখা হবে।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের চত্বরে উঠে পড়ল মিকো।বাড়ির পাশের সরু পথ ধরে হেঁটে চলে গেল পেছনে।

ধপ করে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লেন অলিভার।হতাশ।কি সর্বনাশ করেছে, কে জানে!

কি? চুরি? জানতে চাইল রবিন।

মিকোর ভাই জ্যাক ছিল আমার বন্ধু, জানালেন মিস্টার অলিভার।আমার বন্ধু, গুরু এবং মস্তবড় শিল্পী।হপ্তা দুয়েক আগে মারা গেছে, নিউমোনিয়ায়।

চুপ করে আছে ছেলেরা।

বড় রকমের ক্ষতি, আবার বললেন অলিভার।বিশেষ করে আমার জন্যে, শিল্পরসিকদের জন্যে।তার ঘরে চোর ঢোকাটা—নাহ, ভারি খারাপ কথা!

কিছু চুরি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল রবিন।

এখনও জানে না মিকো।পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে দেখবে আজ রাতেই।

পায়ের শব্দ হল।ফিরে তাকাল রবিন আর মুসা।হাসিখুশি একটা লোক আসছে।গায়ে ধূসর রঙের পশমী-সায়েটার।বলিষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ।কাছে এসে-দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। কি ব্যাপার?

পড়শীর বাড়িতে চোর ঢুকেছিল, মিস্টার জ্যাকবস, বললেন অলিভার।পুলিশ এসেছিল।

তাই, বলল আগন্তুক।সেজন্যেই কয়েকটা স্কোয়াড-কারের আওয়াজ শুনলাম।চোর ধরতে পেরেছে?

নাহ!

খুব খারাপ কথা, বলল জ্যাকবস।অলিভারের পাশ কাটিয়ে সিঁড়িতে উঠে পড়ল।গেট পেরিয়ে ঢুকে গেল চত্বরে।খানিক পরেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের একটা দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল।

আমিও যাই, বললেন অলিভার।যেন খুব দুর্বল লাগছে, এমন ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, আগামীকাল সকালেই তোমাদের সিদ্ধান্ত জানিও।এসব আর সইতে পারছি না।প্রথমে ভূত, তারপর জ্যাকের মৃত্যু, এখন এই চোর! আমার মত বুড়োর জন্যে অনেক বেশি হয়ে গেছে!

.

০৩.

পরদিন, খুব ভোরে, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে এসে হাজির হল রবিন আর মুসা।

ডিসেম্বরের এই হিমেল সকালে একজন খদ্দেরও নেই ইয়ার্ডে।কেমন যেন মৃত মনে হচ্ছে নির্জন, বিশাল, বাতিল মালের ডিপোটাকে।মেরিচাচী আর রাশেদ চাচা ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও।

বড় করে হাই তুলল মুসা।মাঝে মাঝে মনে হয়, কিশোর পাশার সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলেই ভাল হত।সক্কাল বেলা, এখনও কাকপক্ষী ওঠেনি, ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনল! কটা বাজে? বড় জোর ছটা।

না এলেই পারতে, বলল রবিন।কিশোর তত তোমাকে জোর করেনি।নিশ্চয় জরুরি কোন ব্যাপার আছে, নইলে এভাবে ডেকে পাঠাত না।

ইয়ার্ডের বড় লোহার গেটটা আবার বন্ধ করে দিল ওরা।এগোল।

দুই সুড়ঙ্গের কাছে চলে এল।বিশাল গ্যালভানাইজড় পাইপের মুখ থেকে লোহার পাতটা সরিয়ে ঢুকে পড়ল রবিন। পেছনে ঢুকল মুসা। ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে আবার জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিল পাতটা।

হামাগুড়ি দিয়ে এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা।

এত দেরি করলে কেন? দেখেই বলে উঠল কিশোর।

রবিন জবাব দিল না।

গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা।দেরি? ঘুম থেকে উঠেই তো ছুট লাগালাম।দাঁত মাজার সময়ও পাইনি।খাওয়া তো দূরের কথা।কিশোরের দিকে তাকাল।তা।ভোররাতে এই জরুরি তলব কেন? হাতে ওটা কিসের জার? ব্যাঙ-ট্যাঙ ধরে।ভরেছ?

দুআঙুলে ধরে আছে কিশোর চীনামাটির ছোট একটা জার।মুখ খোলা।সামান্য একটু কাত করল।ভেতরে সাদা পাউডার দেখতে পেল মুসা আর রবিন।

ম্যাজিক পাউডার, বলল কিশোর।

ধপ করে একটা আধপোড়া চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। একটা ফাইল কেবিনেটে কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিল। ওভাবে রহস্য করে যখন কথা বল না, বড় বিরক্ত লাগে! ওই পাউডার দেখানর জন্যে কম্বলের তলা থেকে তুলে এনেছ?

জবাব দিল না কিশোর।হাতের কাছের তাক থেকে একটা ফ্লাস্ক নামাল।মুখ।খুলে কয়েক ফোঁটা পানি ঢেলে দিল পাউডারে।ছোট একটা প্লাস্টিকের চামচ নিয়ে।নাড়তে শুরু করল। এটা এক ধরনের স্ফটিকের গুঁড়ো, মেটালিক কম্পাউণ্ড।অনেক পুরানো আমলের একটা অপরাধ বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি এটার কথা।পানিতে গলে যায় এই পাউডার।

ভুরু কোঁচকাল রবিন।কেমিস্ট্রির ওপর লেকচার দিতে ডেকেছ নাকি?

শুনে যাও, ড্রয়ার খুলে টুথপেস্টের টিউবের মত একটা টিউব বের করল কিশোর।মুখ খুলে টিপ দিতেই টুথপেস্টের মতই সাদা জিনিস বেরোল।খানিকটা ফেলল জারে।তারপর মুখ বন্ধ করে রেখে দিল ড্রয়ারে।চামচ দিয়ে জোরে জোরে নেড়ে পাউডারের সঙ্গে মেশাতে লাগল পানি আর পেস্ট।এক ধরনের মলম তৈরি করছি।

কপালে লাগাবে? মস্তিষ্ক বিকৃতির ওষুধ? হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর।গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে, কি জিনিস বানিয়েছে।পানি, পেস্ট আর পাউডার মিলে চমৎকার এক ধরনের ক্রীমমত তৈরি হয়েছে।ব্যস, এতেই চলবে। ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান।ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিল।জারের মুখ।এখন আমাদের কাছেও আছে ম্যাজিক অয়েন্টমেন্ট।

তাতে কি? কৈফিয়ত চাওয়ার মত করে বলল মুসা।

ধর, কোথাও এই মলম মাখিয়ে দিলাম, বলল কিশোর।মিস্টার অলিভারের।ডেস্কের কথাই ধর।ড্রয়ারের হাতলে লাগাতে পারি, ওটা চীনামাটির তৈরি।পাতলা করে মাখলে দেখা যাবে না।হাতল ধরলেই মলম লেগে যাবে হাতে।আধঘণ্টা পর।কালো কালো দাগ পড়ে যাবে লোকটার আঙুলে। হাজার ধুয়েও পুরোপুরি ভোলা যায় না ওই দাগ, অন্তত কয়েকদিন তো নয়ই।

অ, এই ব্যাপার, চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেলল রবিন।তাহলে কেসটা নিচ্ছি আমরা?

গতরাতেই ফোন করেছিলেন মিস্টার অলিভার, বলল কিশোর।জানিয়েছেন, তিনি ঘুমোতে পারছেন না।আমরা চলে আসার পর কয়েকবার নাকি ওই ভূতটা ঢুকেছিল তাঁর ঘরে। অস্তিত্ব টের পেয়েছেন, ছায়াটা দেখেছেন।ভয় পাচ্ছেন।তিনি।

ইয়াল্লা! কিশোর, ওই লোকটার মতিভ্রম ঘটেছে, বলে উঠল মুসা।ওর জন্যে আমাদের কিছুই করার নেই।

হয়ত, মাথা ঝোকাল কিশোর।নিঃসঙ্গ লোকের বেলায় এটা বেশি ঘটে।অনেক উদ্ভট কল্পনা আসে মাথায়, একসময় সেটাকে বাস্তব বলে ধরে নেয়।এজন্যেই কেসটা নিতে

দ্বিধা করেছিলাম কাল।কিন্তু, পুরো ব্যাপারটা তদন্ত না করেই যদি সরে আসি, মানুষটার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে।একটা কথা তো ঠিক, পুলিশকে বললে বিশ্বাস করবে না তার কথা।বড় কোন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে যেতে পারেন, কিন্তু তারাও বিশ্বাস করবে না।যদি সত্যিই পুরো ব্যাপারটা তার কল্পনা হয়ে থাকে, আমাদের কিছুই করার নেই।কিন্তু কোন বদলোকের শয়তানীও। হতে পারে এটা। তাহলে ধরতে হবে লোকটাকে। মিস্টার অলিভারকে এই মানসিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।একে একে দুই সঙ্গীর দিকেই তাকাল।গোয়েন্দাপ্রধান।কি বল? ওঁকে বলব, আমরা অসিছি?

রবিন হাসল।খামোকা জিজ্ঞেস করছ কেন আমাদেরকে? জবাবটা তো তুমি জানই।

গুড, বলল কিশোর।ইসস, একটা মাস ফুড়ৎ করে উড়ে চলে গেল।গাড়িটা থাকলে কি ভালই না হত...।

ওটা তো প্রায় ব্যবহারই করতে পারলাম না আমরা, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল রবিন।বাইরে বাইরেই কাটালাম।সত্যি একটা গাড়ি থাকলে–

নেই যখন, ভেবে আর কি লাভ? বাধা দিয়ে বলল কিশোর। সকাল সাতটায় লস অ্যাঞ্জেলেসের বাস, রকি বীচ থেকে ছাড়ে, খোঁজ নিয়েছি।ওটাই ধরব আমিরা।চাচী ওঠেনি এখনও।একটা চিঠি লিখে রেখে যাব।

আমি যাচ্ছি না, গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল মুসা।

যাচ্ছ না মানে! প্রায় একই সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর আর রবিন।

কিছু না খেয়ে এক কদম নড়ছি না আমি এখান থেকে।এত সকালে গরম গরম না পাওয়া যাক, বাসি পান্তা হলেও চলবে–

হেসে ফেলল অন্য দুজন।

বেশ, হাসতে হাসতে বলল কিশোর। চল। রান্নাঘর থেকে ঠাণ্ডা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে নেব। গতরাতে ইয়া বড় এক কেক বানিয়েছেন চাচী।অর্ধেকটা মেরে দেব আমরা।চলবে?

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।দুই নাম্বার সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল সবার আগে।

.

০৪.

আটটা নাগাদ উইলশায়ারে বাস থেকে নামল তিন গোয়েন্দা।কাছেই প্যাসিও প্লেস।হেঁটেই চলল ওরা।

রেকটরির সামনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেইন্ট জুডস গির্জার যাজক ফাদার স্মিথ।তিন গোয়েন্দাকে দেখে মৃদু হাসলেন।মাথা সামান্য নুইয়ে গুড মর্নিং বললেন।

ছেলেদের আশঙ্কা ছিল, মিসেস ডেনভারের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।হল না।নিরাপদেই সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে এল ওরা।দরজা বন্ধ।টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা কাগজ।তাতে লেখা: ছেলেরা আমি ২১৩, লুকান কোর্টে গেলাম।ওখানেই পাবে আমাকে। এই বাড়ির ঠিক পেছনের বাড়িটাই।পাশের সরু পথটা পেরোলেই ওটার সামনের দরজায় পৌঁছে যাবে।তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম +ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।

কাগজটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল কিশোর।ওই বাড়িতেই চোর ঢুকেছিল গতরাতে।

অ্যাই, তোমরা ওখানে কি করছ? নাকী একটা কণ্ঠ।

ঝট করে ফিরল তিন গোয়েন্দা।নিচে তাকাল।নিচের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস ডেনভার।পরনে ড্রেসিং গাউন।লাল চুল এলোমেলো।

ছেলেরা চাইতেই জিজ্ঞেস করল মহিলা, মিস্টার অলিভার আছেন ঘরে?

মনে হচ্ছে না, জবাব দিল কিশোর।

এই সকাল বেলায় কোথায় বেরোলেন! নিজেকেই যেন, প্রশ্ন করল মিসেস ডেনভার।

জবাব দিল না তিন গোয়েন্দা।নামতে শুরু করছে সিঁড়ি বেয়ে।মিসেস ডেনভারের দিকে ফিরেও তাকাল না ওরা।পাশের সরু পথটা ধরে এগোল।একটা লঞ্জি আর একটা স্টোর রুম পেরিয়ে এল।বেরিয়ে এল পাশের গলিতে।অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের এক কোণে একটা ডাস্টবিন।পথের ওপাশে আরেকটা বাড়ি, দরজাটা গলি পথের দিকে ফেরানো।

গেটেই তামার ফলকে লেখা রয়েছে: ২১৩, লুকান কোর্ট।একতলা, প্রায় স্কয়ার সাইজের ছোট একটা বাড়ি।

ঘণ্টা বাজাল মুসা।খানিক খুলে গেল দরজা।দাঁড়িয়ে আছে মিকো ইলিয়ট।কেমন যেন উদ্ভ্রান্ত চেহারা।

এস, একপাশে সরে ঢোকার জায়গা করে দিল মিকো।

শোবার ঘর আর স্টুডিওর মিশ্রণ বলা যায় এমন একটা ঘরে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সিলিংয়ে স্কাইলাইট।কার্পেট নেই মেঝেতে, আসবাবপত্রও খুব সামান্য।বড়সড় একটা ড্রইং টেবিল আর একটা ইজেল রাখা আছে এক জায়গায়।নানা।রকম ছবি আর স্কেচ ঝুলছে দেয়ালে, আস্তরই দেখা যায় না প্রায়।যেখানে সেখানে।বইয়ের স্তূপ।ছোট্ট একটা টেলিভিশন, বড়সড় দামি একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর একগাদা রেকর্ড অযত্নে পড়ে আছে।

বড়সড় একটা ডিভানে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মিস্টার অলিভার।মুখচোখ শুকনো। নিজেকে শান্ত রাখার জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি, দেখেই বোঝা।যায়।ছেলেদেরকে গুড মর্নিং জানালেন।বললেন, আরও একটা রহস্য যোগ হয়েছে।গতরাতে চোর ঢুকেছিল এ বাড়িতে।সর্বনাশ করে গেছে আমার।

ভেবে আর কি করবে, ফ্র্যাঙ্ক, সান্তনা দিল মিকো।এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা।পুলিশ তাড়া না করলে আরও কিছু নিয়ে যেত ব্যাটা।ছেলেদের দিকে ফিরল সে।ফ্র্যাঙ্কের কাছে শুনলাম, তোমাদের নাকি গোয়েন্দা হওয়ার শখ।এখানে তেমন রহস্যজনক কিছু পাবে বলে মনে হয় না।রান্নাঘরের জানালা খুলে ঢুকেছিল চোর।গ্লাস-কাটার দিয়ে কাঁচ কেটে ভেতরে হাত ঢুকিয়েছে।খুলে ফেলেছে ছিটকিনি।তারপর হাউণ্ডটা নিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে।খুব সাধারণ চুরি।

কিন্তু শুধু হাউণ্ডটাই নিয়ে গেছে ব্যাটা! বলে উঠলেন অলিভার।

ওতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, পুলিশের তাই ধারণা, বলল মিকো।তাছাড়া ওটা ছাড়া ঘরে মূল্যবান আর কিছু নেইও।টেলিভিশনটা, মাত্র নইঞ্চি স্ক্রীন, কোন দামই নেই ওটার। রেকর্ড প্লেয়ারের বডি আর স্পীকারের ফ্রেমে আমার ভাইয়ের নাম খোদাই করা আছে। নিয়ে গেলেও বিক্রি করতে পারত না ওটা।এছাড়া নেবার মত আর কি আছে? জানই তো খুব সাধারণ জীবনযাপন করত আমার ভাই।

অনেক বড় শিল্পী ছিল ও, অলিভারের কণ্ঠে গভীর শ্রদ্ধা।বেঁচে ছিল শুধু।শিল্পসৃষ্টি নিয়েই। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল থাকলে তো!

হাউণ্ডটা কি জিনিস? জানতে চাইল মুসা।

মৃদু হাসল মিকো।একটা কুকুরের মূর্তি।এমন একটা কুকুর, যার কোন অস্তিত্ব নেই।বেঁচে আছে শুধু কুসংস্কারে বিশ্বাসী কিছু মানুষের মনে।খুব রোমাঞ্চপ্রিয় ছিল আমার ভাই, রোমান্টিকতা ফুটিয়ে তুলেছে তার প্রতিটি শিল্পকর্মে।ভূতুড়ে কুকুরের কাহিনী নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে তেমনি একটা কুকুরের কাহিনী শোনা যায়।

হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল কিশোর।জায়গাটার নাম ট্রানসিলভানিয়া।ব্রাম।স্টোকারের ড্রাকুলা ওখানেই বাস করত।

ঠিক, বলল মিকো।কিন্তু ওই কুকুরটা রক্তচোষাও না, মায়ানেকড়েও না।ওই গাঁয়ের লোকের ধারণা, ওটা আসলে এক জমিদারের প্রেতাত্মা, কুকুরের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ-সম্পর্কে চমৎকার একটা গল্পও আছে।ওই জমিদার ছিল দুর্ধর্ষ শিকারী, একপাল ভয়ঙ্কর আধবুনো কুকুর ছিল তার। নেকড়ের রক্ত ছিল কুকুরগুলোর শিরায়। জানোয়ারগুলোকে সব সময় তৎপর রাখার জন্যে পুরোপুরি খেতে দিত না লোকটা। একদিন, পেটে খিদে নিয়ে কি করে জানি খেয়াড় থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা কুকুর।

সর্বনাশ! বিড়বিড় করল রবিন।

হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়ল।তারপর ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা।এটা কিন্তু সত্যি, বানানো নয়।একটা শিশুকে খুন করে বসল কুকুরটা।রাগে কাঁপতে কাঁপতে জমিদারের।কাছে ছুটে এল সন্তানহারা পিতা।সবগুলো নেকড়ে-কুকুরকে মেরে ফেলার দাবি জানাল।প্রত্যাখ্যান করল

জমিদার।উল্টে, টিটকিরি দিয়ে বলল, চাইলে শিশুটার।বিনিময়ে কয়েকটা পয়সা দিতে পারে সে বাপকে।আর রাগ সামলাতে পারল না বাবা।বিশাল এক পাথর তুলে নিয়ে আক্রমণ করল জমিদারকে।মারা গেল।জমিদার।মৃত্যুর আগে অভিশাপ দিয়ে গেল।আবার সে আসবে গাঁয়ে, অন্য রূপে।গায়ের কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

তারপর নিশ্চয় কুকুর হয়ে ফিরে এসেছিল লোকটা? বলল মুসা।

হ্যাঁ।এক বিশাল হাউণ্ড, আগের কথার খেই ধরল মিকো, জমিদারের সবকটা কুকুরকে মেরে ফেলল গাঁয়ের লোকজন।তারপর, এক অন্ধকার দুর্যোগের রাতে ঘটল ঘটনা।বিরাট এক কুকুরকে দেখা গেল গাঁয়ের পথে।গোঙাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই হাঁক ছাড়ছিল ক্ষুধার্ত কণ্ঠে।চামড়ার ওপর দিয়ে পাঁজরার হাড় গোনা যাচ্ছিল।আতঙ্কিত হয়ে পড়ল লোকেরা। দুএকজন দুঃসাহসী লোক খাবার এনে।রাখল কুকুটার সামনে।কিন্তু চুলোও না হাউণ্ডটা। কারও কোন ক্ষতিও করল না।এরপর থেকে প্রতি অমাবস্যার রাতেই নাকি ফিরে আসতে লাগল কুকুরটা।লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালাল।আজও নাকি দেখা দেয় ওই কুকুর।পোড়ো গ্রামটায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার রাতে, হাঁক ছাড়ে ক্ষুধার্ত গলায়।হতে পারে, কাহিনীটা। বানানো।রোমাঞ্চকর এক ভূতুড়ে গপ্পো!

ওই কুকুরটার ছবি এঁকেছিলেন আপনার ভাই, জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ছবি নয়, মূর্তি।প্রতিকৃতি, বলল মিকো।কাঁচ আর স্ফটিকের বিশেষজ্ঞ বলা যেত তাকে। ওই জিনিস দিয়েই বানিয়েছিল।

অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম ওই হাউণ্ডের মূর্তি, অনেকক্ষণ পর কথা বললেন অলিভার।আমার জন্যেই বানিয়েছিল।ওটা, জ্যাক।মাসখানেক আগে শেষ করেছিল কাজ।মূলার গ্যালারিতে একটা শো হওয়ার কথা ছিল তার শিল্পের।ওখানে দেখানর জন্যে রেখে দিয়েছিল মূর্তিটা। আমার কোন আপত্তি ছিল না।চুরি যাবে জানলে কি আর রাখতে দিতাম!

কাঁচের একটা কুকুর, না? বলল রবিন।

স্ফটিক, শুধরে দিলেন অলিভার।স্ফটিক এবং স্বর্ণ।

স্ফটিকও এক ধরনের কাঁচই, বলল মিকো।তবে স্পেশাল কাঁচ।অতি মিহি সিলিকার সঙ্গে লেড অক্সাইড মিশিয়ে তৈরি।সাধারণ কাঁচের চেয়ে ভারি, অনেক বেশি উজ্জ্বল।কাঁচ কিংবা স্ফটিক গলিয়ে নিয়ে কাজ করত আমার ভাই।বারবার গরম করে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে বানিয়ে নিত কোন একটা মূর্তি।ঘষেমেজে তারপর অ্যাসিডে চুবিয়ে মসৃণ করে নিত ওপরটা।এক অসামান্য সৃষ্টি ওই হাউণ্ড।সোনালি রঙে আঁকা চোখগুলো দেখে মনে হত একেবারে জ্যান্ত।দুই কশে ফেনাও তৈরি হয়েছে স্বর্ণ দিয়ে।

হয়ত আবার ফিরে পাওয়া যাবে ওটা, আশা প্রকাশ করল রবিন।ও ধরনের একটা জিনিস বিক্রি করা এত সহজ না।

কঠিনও না, বললেন অলিভার। এসব জিনিসের প্রতি যাদের লোভ আছে, যারা জ্যাক ইলিয়টকে চেনে, তারা ঠিকই কিনে নেবে।

পুরো ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। এখানেই কি কাজ করতেন তিনি? কাঁচ গোনর চুলা কোথায়?

এখানে না, জবাব দিল মিকো। পূর্ব লস অ্যাঞ্জেলেসে তার ওয়ার্কশপ। চব্বিশ ঘণ্টার বিশ ঘণ্টাই ওখানে কাটাত সে।

তার তৈরি আর কোন মূর্তি নেই। নিজের জন্যে কিছুই রাখেননি? নাকি ওয়ার্কশপে রয়ে গেছে?

বেশ কিছু সংগ্রহ তার আছে। নিজের আর অন্যান্য শিল্পীদের তৈরি। এই ঘরেই রাখত ওগুলো। জ্যাকের মৃত্যুর পর, একে একে সব জিনিসই সরিয়ে নিয়ে। গেছি আমি নিরাপদ জায়গায়। শুধু ওই একটা জিনিসই বাকি ছিল। ব্যাপারটা নিতান্তই দুর্ঘটনা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অলিভার।

আমার ভাইয়ের গ্যালারি শো শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিন আগে, বলল মিকো। অনেকের কাছেই মূর্তি বিক্রি কিরেছিল জ্যাক। ভাল ভাল কয়েকটা জিনিস আবার কয়েকদিনের জন্যে চেয়ে এনে শোতে পাঠিয়েছিল। একে একে ওগুলো আবার যার যার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি গত বিকেলে হাউণ্ডটা নিয়ে ফিরেছি মিউজিয়ম থেকে। এ ঘরে ঢুকেছি অন্য কারও কোন জিনিস রয়ে গেল কিনা, দেখার জন্যে। আসলে, আগে গিয়ে হাউণ্ডটা দিয়ে আসা উচিত ছিল ফ্র্যাঙ্ককে, তাহলে আর এ অঘটন ঘটত না।—যাই হোক, এসে ঢুকলাম। বইগুলো তুলে তুলে দেখছি, তলায়। কিছু পড়ে আছে কিনা। কিছুই পেলাম না। পায়খানা চাপল এই সময়। গিয়ে ঢুকলাম বাথরুমে। বাথরুম থেকেই একটা খুটখাট আওয়াজ শুনেছি। বেড়াল টেড়াল হতে পারে ভেবে বেশি আগ্রহ করলাম না। বাথরুম থেকে বেরোতেই দেখি, একটা লোক ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোর ছাড়া কিছু না, ধরেই নিলাম। রাস্তার মোড়েই ছিল পুলিশ। ছুটে এল। উত্তেজনায় তখন ভুলেই গিয়েছিলাম মূর্তিটার কথা! ভয়।

বড় বেশি খামখেয়ালি করেছ তুমি, মিকো, গোমড়ামুখে বললেন অলিভার। তোমাকে সকালেই তো ফোনে বলেছিলাম, মূর্তিটা নিয়ে আগে আমার ওখানে চলে। যেও।

আর লজ্জা দিও না, ফ্র্যাঙ্ক। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে মিকো, ভুলই হয়ে গেছে!

আর কেউ জানত, গতকাল কুকুরটা নিয়ে আসা হবে গ্যালারি থেকে? অলিভারের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পৌঁছে দেয়া হবে আপনার ওখানে?

মাথা নাড়লেন অলিভার আর মিকো, দুজনেই।

জিনিসটীর বীমা করা ছিল? জানতে চাইল রবিন।

ছিল, কিন্তু তাতে কি? জবাব দিলেন অলিভার।তাতে তো আর জিনিসটা ফিরে পাওয়া যাবে না, টাকা পাওয়া যাবে।টাকা আমি চাই না।শিল্পের ক্ষতিপূরণ টাকা দিয়ে হয় না।

আঙুলের ছাপ বা চোখের অন্য কোন চিহ্ন খুঁজেছে পুলিশ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

গতরাতের অর্ধেকটাই ওসব খুঁজে পার করেছে পুলিশ, জবাব দিল মিকো।সারা ঘরে পাউডার ছড়িয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজেছে।কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ওরা।এখন ফাইল ঘাটাঘাটি করছে। ওস্তাদ সব শিল্প-চোরের ছাপের সঙ্গে এ-বাড়িতে পাওয়া আঙুলের ছাপগুলো মিলিয়ে দেখছে।

কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখে না পুলিশ, প্রশংসা করল কিশোর।সব ওরাই করছে, হাউণ্ড চুরির ব্যাপারে আমরা আর কি করব?

ঠিকই, মাথা ঝোকালেন অলিভার।উঠে পড়লেন।মিকো ইলিয়টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে।নিজের বাড়িতে যাবেন।

চত্বরেই দেখা গেল মিসেস ডেনভারকে।ফুলের ঝাড় থেকে মরা পাতা বাছছে।ওকে অগ্রাহ্য করলেন অলিভার।সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওপরে।পেছনে তিন গোয়েন্দা।

বসার ঘরে এসে ঢুকল ওরা।দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলেন অলিভার।

পকেট থেকে ছোট জারটা বের করল কিশোর।কি আছে ওতে, জানাল প্রথমে।বলল, আপনার ডেস্কের ড্রয়ারের হাতল মাখিয়ে রাখব।তারপর বেরিয়ে যাব আমরা সবাই।কেউ ড্রয়ার খোলার জন্যে হাতল ধরলেই হাতে কালো দাগ পড়ে যাবে তার।

সেজন্যে বেরিয়ে যাবার দরকার নেই, বললেন অলিভার।আমি থাকলেও ঘরে ঢোকে সে। বন্ধ দরজা এমনকি দেয়ালও তার কাছে কোন বাধা নয়। ওগুলো গলেই চলে আসে স্বচ্ছন্দে।ড্রয়ারের সামান্য কাঠ ঠেকাতে পারবে না তাকে।হাতলে হাত দেয়ার দরকারই পড়বে না।

মিস্টার অলিভার, জোর দিয়ে বলল কিশোর।আগে চেষ্টা করে দেখতে হবে।আমাদের। হবে না বলে কিছুই না করলে, সত্যি সত্যি হবে না।আপনিই তো বলেছেন, বাইরে থেকে ফিরে এসে খোলা পেয়েছেন ড্রয়ার।

বেশ, বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন বলে মনে হল না, তবু সম্মতি দিলেন অলিভার।সব রকমভাবে চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি আমি।যাও, মাখাও তোমার মলম।তারপর চল, বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি।খুব খিদে পেয়েছে।

ঠিক, চেঁচিয়ে উঠল মুসা।খুব ভাল কথা বলেছেন।খিদেয় নাড়িভুড়িই হজম হয়ে যাচ্ছে আমার!

ড্রয়ারের হাতলে সাবধানে মলম মাখাল কিশোর।হাত লাগাল না, কাগজের তোয়ালেতে লাগিয়ে নিল আগে, তারপর ডলে ডলে ভালমত লাগাল চীনামাটির হাতলে।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অলিভার।কোথায় খেলে ভাল হয়, প্রস্তাব দিল মুসা।উত্তেজনায় জোরে জোরে কথা বলছে সে।দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন অলিভার।সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ওরা চারজন।

শূন্য চত্বর।গেটের কাছে সাক্ষাৎ হয়ে গেল মিসেস ডেনভারের সঙ্গে।আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে তার কাছাকাছি।টমি গিলবার্ট।গির্জার দিকে তাকিয়ে আছে।ওরা।

গির্জার চত্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যামবুলেন্স।

কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল মুসা।

গির্জার দারোয়ান, বলল টমি।মারাত্মক আহত! এই খানিক আগে চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় পাওয়া গেছে তাকে।বেহুশ! দেখতে পেয়েছেন, ফাদার স্মিথ!

.

০৫.

গির্জায় ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা আর মিস্টার অলিভার।

একটা স্ট্রেচার তুলে নিয়েছে সাদা পোশাক পরা দুজন লোক।তাতে দারোয়ান পল, গলা পর্যন্ত টেনে দেয়া হয়েছে চাদর।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার স্মিথ।পেছনে এল মিসেস ব্রাইস।

ওকে মেরে ফেলেছে! বিলাপ করে কেঁদে উঠল ব্রাইস।মেরে ফেলেছে! খুন! খুন করেছে বেচারাকে!

ব্রাইস, ভুল বলছ, শান্ত গলায় বললেন ফাদার।মেরে ফেলেনি।ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, চেহারা ফ্যাকাসে।কম্পিত হাতে গির্জার দরজায় তালা লাগালেন তিনি।গতরাতে ওর সঙ্গে আসা উচিত ছিল আমার! একা তালা লাগাতে পাঠানো উচিত হয়নি মোটেই! ইসস, সারাটা রাত ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে ছিল বেচারা!

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ফাদার।সব আমার দোষ! ওরও বাড়াবাড়ি আছে! কতবার বলেছি, রাতে বাতি নেবে না।অন্ধকার রাখবে না চত্বর।না, কথা শুনবে না।বিদ্যুতের খরচ বাঁচায়।এখন হল তো!

বুদ্বু! একেবারে গাধা!কাঁদতে কাঁদতে বলল ব্রাইস।কি এমন খরচ বাঁচত! এখন? এখন তো থাকবে হাসপাতালে পড়ে!

ওসব ভেবে কিছু হবে না, ব্রাইস, বললেন ফাদার।যাও...যাও, চমৎকার এক কাপ চা বানিয়ে খাও গিয়ে।ভাল লাগবে।অ্যামবুলেন্সের পেছনের সিটে গিয়ে উঠলেন তিনি।দরজা বন্ধ করে দেয়া হল।স্টার্ট নিয়ে চলে গেল গাড়ি।

শুনেছেন, চা! অলিভারের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ব্রাইস।চমৎকার এক কাপ চা খেতে বলছে! ওদিকে বোধহয় মারাই গেল লোকটা! আমাকে চা খেয়ে শান্ত, হতে বলছে! ঈশ্বর! লোকটার এক্কেবারে মায়াদয়া নেই! ভূতটা হয়ত শেষই করে দিল পল বেচারাকে... ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল মহিলা রেকটরির দিকে।

ভূত? অলিভারের দিকে চেয়ে বলল রবিন।

মিসেস ব্রাইসের ধারণা, গির্জার আশপাশে ভূত আছে, বললেন অলিভার।দেখেছেও নাকি সে।এর আগের ফাদার, বৃদ্ধ হয়ে মারা গেছিলেন এখানেই।বছর তিনেক আগে।কারও কারও ধারণা, গির্জার মায়া ত্যাগ করতে পারেননি তিনি।মৃত্যুর পরেও এসে ঘুরে বেড়ান এর ভেতরে।চল, খাওয়ার কাজটা সেরে ফেলি।

উইলশীয়ার বুলভার্ড-এর দিকে চলল ওরা।

মিস্টার অলিভার, হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।আপনার ঘরে যে আসে, সে আর এই গির্জার ভূত কি একই? কি মনে হয় আপনার?

নিশ্চয় না! জোর দিয়ে বললেন অলিভার।ফাদারের ভূত হলে দেখামাত্রই চিনতাম।তবে সেটা আছে কিনা, শিওর না আমি।আজ অবধি শুধু মিসেস ব্রাইসই দেখেছে ওটা, আর কেউ না।মহিলা বলে, রাতে, মোমবাতি হাতে গির্জার ভেতরে ঘুরে বেড়ায় ফাদারের প্রেতাত্মা।আমার বিশ্বাস হয় না।কেন সেটা করবেন তিনি? খুব ভাল লোক ছিলেন।ভাল লোকেরা মৃত্যুর পর ভূত হয় না।কতদিন তাঁর সঙ্গে দাবা খেলেছি।নাহ্, তার ভূত হতেই পারে না।

আড় নিল ওরা।কয়েকটা ব্লক পেরিয়ে এসে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে।দাঁড়াল।তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন অলিভার।

সুন্দর রেস্টুরেন্ট।পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।দরজার পেতলের হাতলগুলোও নিয়মিত।ঘষামাজায় ঝকঝক করছে। টেবিলে পরিষ্কার টেবিলক্লথ, কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা। প্রতিটি টেবিলের মাঝখানে ফুলদানীতে ফুল।কৃত্রিম, কিন্তু ভাল করে খেয়াল না করলে বোঝাই যায় না, মনে হয় আসল।খদ্দের নেই।অসময়।নাশতার সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগে, আবার লাঞ্চেরও সময় হয়নি এখনও।ওরা চারজন আর একজন ওয়েটার ছাড়া কোন লোক নেই পুরো ঘটাতে।

খাবার এল।

মিস্টার অলিভার, প্লেট টেনে নিতে নিতে বলল কিশোর, আপনার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা অনেক বড়।সেই তুলনায় তোক দেখিনি।ভাড়াটে কি নেই? শুধু মিসেস ডেনভার–

মহিলার নামটা শুনেই মুখ বাঁকালেন অলিভার।

..মিসেস ডেনভার, আবার বলল কিশোর।আর টমি গিলবার্ট।বড় অসময়ে বাসায় দেখা যায় লোকটাকে।

ভারমন্টে, বাজারের এক দোকানে কাজ করে, মাঝরাত থেকে সকাল পর্যন্ত, বললেন অলিভার।ছেলেটার, চালচলন কেমন একটু অদ্ভুতই মনে হয় আমার কাছে।টমি, নামটাও যেন কেমন।বুড়ো হলেও টমি বলে ডাকা হবে, ভাবতেই হাসি পায়।আমার সবচেয়ে ছোট অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছে সে।তেমন আয় নেই, বোঝা যায়।একটা মেয়েও ভাড়া থাকে আমার বাড়িতে।লারিসা, লারিসা ল্যাটনিনা।টমির বয়েসী, ওর পাশের অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছে।শহরতলীতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করে।আর, ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস একজন স্টকব্রোকার।

পুলিশ চলে যাবার পর গত সন্ধ্যায় যে লোকটাকে দেখলাম? জানতে চাইল রবিন।

হ্যাঁ।বাড়ির শেষ মাথায় কোণের একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে।খুব সকালে বেরিয়ে অফিসে চলে যায়, দুপুরের পর ফেরে।ওর এক ভাগ্নে, বব বারোজ, কলেজে পড়ে।জ্যাকবসের কাছেই থাকে।আরও একজন থাকে আমার বাড়িতে।ব্রায়ান এনড্রু, ওরফে বেড়াল-মানব।

বেড়াল-মানব! বিশাল এক স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাতে গিয়েও থেমে গেছে মুসা।

হাসলেন অলিভার।আমিই ওই নাম রেখেছি।বেড়াল নিয়ে মেতে থাকে।রোজ বিকেল পাঁচটায় পাড়ার যত ভবঘুরে বেড়াল আছে, এসে হাজির হয় ওর ঘরে।ওগুলোকে খাবার দেয় সে।নিজের পোষা একটা বিড়াল আছে, একটা সিয়ামিজ বেড়াল।

কাজকর্ম কি করে? জানতে চাইল মুসা।

কিছু না, বললেন অলিভার।ব্যাংকে বোধহয় জমানো টাকা আছে।তুলে আনে, আর খরচ করে।সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে ঘোরে।ভবঘুরে বেড়াল ধরে আনে, যেগুলো তার বাড়ির সন্ধান পায়নি।আহত, বা রোগা বেড়াল দেখলে, তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের খরচে পৌঁছে দিয়ে আসে পশু হাসপাতালে।

আর কে কে বাস করে আপনার বাড়িতে? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

আরও অনেকেই থাকে।মোটমাট বিশজন ভাড়াটে।বেশির ভাগই খেটে খাওয়া মানুষ।যাদের নাম বললাম, তারা ছাড়া আর সবাই ছুটিতে বাইরে গেছে।আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধুদের ওখানে বড়দিন পালন করবে।ছুটি শেষ হলেই ফিরে আসবে আবার।ব্রায়ানের ভাগ্নেকে ধরলে, এখন মোট সাতজন আছে আমার।বাড়িতে।

ভালই, বলল কিশোর।সন্দেহের আওতা খুব সীমিত।

ঝট করে চোখ তুললেন অলিভার।তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।তুমি কি ভাড়াটেদের কাউকে সন্দেহ করছ? ওদেরই কেউ আমার ঘরে ঢোকে, ভাবছ?

আরও প্রমাণ দরকার, নইলে শিওর হয়ে বলতে পারব না।তবে, লোকটা এমন কেউ, যে জানে, কখন আপনি বাড়ি থাকেন, কখন থাকেন না।আমরা বেরিয়ে এসেছি দেখে থাকলে, আজও ঢুকতে পারে আপনার ঘরে।

কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার অলিভার।হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিশোর।আমার ডেস্ক ঘাটার অনেক সময় পেয়েছে সে আজ।

খাওয়া শেষ হল।ওয়েটারকে বিল আনতে বললেন অলিভার।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল চারজনে।উইলশায়ার রোড ধরে এসে ঢুকল।প্যাসিও প্লেসে। গির্জার সামনের রাস্তা একেবারে নির্জন।অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে পৌঁছুল ওরা।ঘরের ভেতরে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে মিসেস ডেনভার, গেট থেকেই শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওই মেয়েমানুষটাকেও খেতে হয় মাঝে মাঝে, বলে উঠলেন অলিভার, তাই রক্ষে! নইলে চব্বিশ ঘণ্টায় কখনও বুড়িটার চোখের আড়ালে থাকতে পারতাম না।শকুনি, শকুনি!

হেসে ফেলল মুসা।খুব বেশি বিরক্ত করে বুঝি?

করে মানে? সারাক্ষণ ভাড়াটেদের পেছনে লেগে আছে।কে কখন কি করছে না করছে, চোখ রাখছে।উদ্ভট সব প্রশ্ন করে বসছে মাঝে মাঝেই।শুধু তাই না, কে কি খায় না খায়, তা-ও ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট ঘেঁটে দেখে আসে।কয়েকবার ডাস্টবিন ঘটতে দেখেছি আমি ওকে।বুড়িটার বকবকানির দৌলতে কে কি খায়, কি করে, আমারও জানা হয়ে গেছে অনেকখানি। জানি, লারিসার প্রিয় জিনিস চকলেট, ডিনার খায় ঠাণ্ডা করে। ব্রায়ানের বেড়ালগুলো হপ্তায় চল্লিশ টিন।খাবার সাবাড় করে, এটাও জানি।এ-বাড়িতে থেকে কারও গোপনীয়তা বলে আর কিছু রইল না।সব ওই বুড়িটার কল্যাণে।

অলিভারের পিছু পিছু ব্যালকনিতে এসে উঠল তিন গোয়েন্দা।তালা খুললেন তিনি।দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন।ছেলেরাও ঢুকল।

খবরদার! ঘরে ঢুকেই সাবধান করল কিশোর।কেউ কোন জিনিসে হাত দেবে না।পকেট থেকে ছোট একটা আতশী কাঁচ বের করে সোজা গিয়ে ঢুকল।মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে।কাঁচের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা করল ড্রয়ারের হাতল।

বাহু, চমৎকার! চেঁচিয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।

প্রায় ছুটে দরজায় এসে দাঁড়ালেন অলিভার।

ড্রয়ার খুলেছিল কেউ, জানাল কিশোর।হাত দিয়েছিল হাতলে।মানুষের হাত, ভূত-ফুত না।মলমে ছাপ পড়ে আছে।–রবিন, একটা তোয়ালে, প্লীজ।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে একটা কাগজের তোয়ালে এনে দিল রবিন।

সাবধানে হাতলটা মুছে ফেলল কিশোর।

ড্রয়ার খুলব? জানতে চাইলেন অলিভার।

নিশ্চয়।..আমিই খুলছি, ড্রয়ারটা টেনে খুলল কিশোর।দেখুন, কিছু চুরি হয়েছে কিনা।

দেখলেন অলিভার।না, সব ঠিকই আছে।অবশ্য কখনোই কিছু চুরি হয়নি।ঘাটাঘাটি করে যায় শুধু।আজ টেলিফোনের বিলটা খুলে দেখেছে কেউ।সকালে, ড্রয়ারের শেষ দিকে ছিল ওটা, ভাজ করা।খামে ভরা।

খামের ওপর মলম লেগে আছে, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে কিশোরের।খুব ভালমতই হাতে লাগিয়েছে মলম।

ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর।বসার ঘর পেরিয়ে সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।ঝুঁকে ভালমত পরীক্ষা করল হাতলটা।এখানে মলম মাখাইনি।কিন্তু এখন লেগে আছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কোন্ পথে বেরিয়ে গেছে চোর, কিশোরের কথার পিঠে বলল রবিন। দরজা খুলে হেঁটে চলে গেছে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতই।

এবং দরজায় আবার তালা লাগিয়ে গেছে, বলল কিশোর।দরজা খুলে বাইরের দিকের বোল্ট-লক পরীক্ষা করল।মলম লেগে আছে হালকাভাবে।হুমম! চাবি আছে ওর কাছে!

অসম্ভব! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার।ওটা স্পেশাল লক।চাবি থাকতেই পারে না কারও কাছে!

কিন্তু আছে, দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিশোর।দরজা বন্ধ করে দিল আবার।

সবকটা ঘরে তন্ন তন্ন করে মলমের দাগ খুঁজল ওরা এরপর।বাথরুমের আয়নায় পাওয়া গেল ছাপ।পাওয়া গেল ওষুধের বাক্সের গায়ে।

মেডিসিন কেবিনেটও খুলেছিল সে, হাসল কিশোর।

ঘোঁৎ ধরনের একটা শব্দ করলেন অলিভার।রেগে গেছেন।

যাক, উন্নতি হচ্ছে তদন্তের, আবার বলল কিশোর।

তাই কি?

নিশ্চয়, গভীর আস্থা কিশোরের কণ্ঠে।প্রথমেই জেনে গেলাম, আপনার ঘরে ঢুকে ড্রয়ার, জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যে, তার হাতে মলম লাগে।তারমানে অশরীরী নয়।আর দশজন মানুষের মতই স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলে ঢুকেছিল সে আজ সকালে, বেরিয়ে গেছে আবার দরজা দিয়েই।অর্থাৎ, দেয়াল কিংবা কাঠের দরজা ভেদ করে সে আসে না।এবার গিয়ে চত্বরে বসব।চোখ রাখব, কারা।আসছে, কারা যাচ্ছে।হাতের দিকে নজর রাখব। কালো দাগ দেখলেই ধরব ক্যাক করে।

এখানে যারা থাকে, তাদের কেউ যদি না হয়? বললেন অলিভার।

আমি শিওর, এ-বাড়িতেই থাকে সে।এমন কেউ, যে সকালে আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

অলিভারকে ঘরে রেখে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।চত্বরে নামল।বসে পড়ল গিয়ে সুইমিং পুলের কিনারে সাজানো চেয়ারে।

দারুণ একখান পুলি! চোখ চকচক করছে মুসার।

কেউ কোন জবাব দিল না।

কি ভেবে উঠে পড়ল রবিন।পুলের কিনারে গিয়ে বসে পড়ল।তাকাল নিচে।টলটলে পরিষ্কার পানি।তলায় নীল আর সোনালি রঙের মোজাইক।খুব সৌখিন লোকের কাজ! স্যান সিমেঅন-এর হাস্ট ক্যাসলে আছে এমন একটা পুল, দেখেছি।পানিতে হাত রাখল সে।উষ্ণ রাখা হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে।

গেটের বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল।লাফিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল একটা ধূসর বেড়াল, পেছনে একজন লোক। তামাটে চুল। সাদা সোয়েটারের ওপর খাকি। রঙের জ্যাকেট। ছেলেদের দিকে একবার তাকাল।কোনরকম আগ্রহ দেখাল না।বেড়ালটার পিছু পিছু চত্বর পেরিয়ে চলে গেল বাড়ির এক প্রান্তের একটা দরজার কাছে।বেড়ালটাকে দরজার গোড়ায় রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল।মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই বেরিয়ে এল আবার, হাতে খাবারের প্লেট।নামিয়ে রাখল।খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়াল।ঝুঁকে গভীর আগ্রহে ওটার খাওয়া দেখতে লাগল।লোকটা।

ব্রায়ান, ফিসফিস করে বলল রবিন।গত সন্ধ্যায়ও দেখেছি ওকে আমরা।

নতুন একটা ভবঘুরে খুঁজে পেয়েছে, ইঙ্গিতে বেড়ালটাকে দেখাল মুসা।অসময়ে খাওয়াচ্ছে দেখছ না।পাঁচটায় খাবার সময়, জানা নেই ওটার।

দ্রুত খাওয়া শেষ করল বেড়ালটা, নিঃশব্দে চলে গেল বাড়ির পেছনে।শূন্য প্লেটটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ব্রায়ান এনড্রু।

সিঁড়িতে আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ, আবার খুলে গেল গেট।ভেতরে ঢুকল বলিষ্ঠ সেই লোকটা।জ্যাকবস।ঠোঁটের কোণে সিগারেট।ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝোকাল সে।ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখে হাসল।তারপর চলে গেল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে, ব্রায়ানের পাশের ফ্ল্যাটটাই তার।ও হাত দেবার আগেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজা। বেরোল একটা ছেলে।আঠারো-উনিশ বছর বয়েস।

মামা, ভ্রুকুটি করল ছেলেটা, সিগারেট একবারও সরাতে পার না মুখ থেকে!

বকিসনে, বব।দিনটা খুব খারাপ যাচ্ছে আজ।অ্যাশট্রেটা দিবি?

ধুয়ে রেখে দিয়েছি পুলের কাছে।নাওগে।উহ, কি বিচ্ছিরি গন্ধ! বাড়ির আবহাওয়াই দূষিত করে দিচ্ছ!

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাকবস।লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে পুলের ধার থেকে তুলে নিল বিশাল, ছোটখাট একটা গামলার মত অ্যাশট্রে।ছেলেদের পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল সিগারেটের।ধূমপান করে চলল নীরবে।

আমার ভাগ্নেটার মত নিশ্চয় পাকামো কর না তোমরা? এক সময় কথা বলল।জ্যাকবস। গুরুজনদের কোন ব্যাপারে নাক গলাও না তো?

আমার বাবা-মা সিগারেট খায় না, সাফ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

ঘোৎ করে উঠল জ্যাকবস।আমারও খাওয়া উচিত হচ্ছে না।তবে, সাবধানে থাকি আমি। যেখানে-সেখানে ছাই ঝাড়ি না, আগুন লাগিয়ে দিই না।এমনভাবে বলছে সে, যেন আগুন লাগিয়ে দেয়াটাই সিগারেট খাওয়ার একমাত্র দোষ।অফিসে এ-রকম আরেকটা অ্যাশট্রে আছে আমার।কাজ করার সময়ও সতর্ক থাকি আমি।অ্যাশট্রের মাঝখানে পোড়া সিগারেট খুঁজে রেখে তারপর কাজে হাত দিই।

সিগারেটে সুখটান দিল জ্যাকবস।পোড়া টুকরোটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল। অ্যাশট্রেটা নিয়ে চলে গেল তার ঘরে।

কত রকমের মুদ্রাদোষ যে থাকে মানুষের বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

তোমার যেমন ইয়াল্লা আর খাইছে, ফস করে বলে বসল রবিন।

কথাটা কানে তুলল না মুসা।পুলের ওপাশে আরেকটা ফ্ল্যাটের দরজার দিকে চেয়ে আছে। টমি গিলবার্ট কি ঘরেই আছে! পর্দা টানা! কিশোরের দিকে তাকাল।চল না, বেল বাজাই? দেখি আছে কিনা–

চুপ! হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে কিশোরের।

চত্বরে বেরিয়ে এসেছে মিসেস ডেনভার।এক টুকরো টিপেপার দিয়ে জোরে জোরে ডলছে হাত।পুলের কাছে ছেলেপিলেদের বসা নিষেধ।নাকী গলায় খেঁকিয়ে উঠল সে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মহিলার সামনে।মিসেস ডেনভার, কি হয়েছে আপনার হাতে? কি লাগিয়েছেন?

মানে?

হাত দুটো দেখাবেন? জোরে জোরে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

কিশোরের গলা শোনার অপেক্ষায়ই ছিলেন অলিভার।ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন।

আপনার হাতে কালো দাগ, কিসের? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

এই ইয়ে, মানে– থতমত খেয়ে গেছে মিসেস ডেনভার।রান্নাঘরে–

আপনি মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিলেন, কঠিন কণ্ঠে বলল কিশোর।তাঁর ডেস্কের ড্রয়ার খুলেছেন, কাগজপত্র ঘেঁটেছেন, চিঠিপত্র পড়েছেন, মেডিসিন কেবিনেট খুলেছেন, বাথরুমের আয়নায় হাত দিয়েছেন।কেন?

০৬.

জীবনে বোধহয় এই প্রথম বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল মিসেস ডেনভার।হাঁ করে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে।রক্ত জমেছে মুখে, লাল, আরও লাল হয়ে উঠছে।

ডলে ফল হবে না, বলল কিশোর।সহজে উঠবে না ওই দাগ।

নেমে এসে ছেলেদের পাশে দাঁড়ালেন অলিভার। মিসেস ডেনভার, আপনার। সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।

অলিভারের কথায় চমকে যেন বাস্তবে ফিরে এল ম্যানেজার।নাকী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, জানেন, এই বিচ্ছটা কি বলেছে আমাকে? চোর বলেছে!

জানি।ঠিকই বলেছে! জবাব দিলেন অলিভার।বাড়ির সবাই জানুক, এটা নিশ্চয় চান না? মিসেস ডেনভারের দরজার দিকে এগোলেন।আসুন।কথা বলব।ছায়াশ্বাপদ।

আমি...আমি ব্যস্ত, গলার স্বর খাদে নেমে গেছে ম্যানেজারের।অনেক-অনেক কাজ পড়ে আছে, জানেন আপনি।

জানি, জানি, বললেন অলিভার।আপনার তো চব্বিশ ঘন্টাই কাজ! তো, আজ আর কি কি করার ইচ্ছে? ডাস্টবিন ঘটবেন? আর কারও ঘরে ঢুকবেন?...আসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকতে পারব না+নাকি, উকিলকে টেলিফোন করব?

আর কিছু বলতে হল না।প্রায় উড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল মিসেস ডেনভার।

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন অলিভার।তোমাদের আসা উচিত হবে না।ওখানে বস।আমি কথা বলে আসছি।

দরজা খোলা।ভেতরে ঢুকে পড়লেন অলিভার।বন্ধ করে দিলেন দরজা।

চুপচাপ বসে রইল তিন গোয়েন্দা।কান খাড়া।মিসেস ডেনভারের তীক্ষ্ণ, নাকী গলা শোনা যাচ্ছে।কিন্তু কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।খানিক পর পরই থেমে।যাচ্ছে তার গলা।ছেলেরা বুঝতে পারছে, তখন নিচু গলায় কথা বলছেন অলিভার।তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে না।

খুব ভালমানুষ, এক সময় বলল মুসা।কিন্তু, আমার মনে হয়, প্রয়োজনে সাংঘাতিক কঠোর হতে পারেন তিনি।মোলায়েম গলায় কি ধমকটাই না লাগালেন ম্যানেজারকে।

পুলের ওপাশে দরজা খোলার শব্দ হল।ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।বেরিয়ে।আসছে টমি গিলবার্ট।রোদের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে, অন্ধকারের জীবের মত।পরনে মোটা সুতার পাজামা, দলে-মুচড়ে আছে।শার্টের কয়েকটা বোতাম।নেই।পা খালি।হাই তুলল সে।

গুড মর্নিং, বলল কিশোর।

আবার চোখ মিটমিট করল টমি।হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রগড়াল।চুল-মুখ অপরিষ্কার, ধোয়া হয়নি।

আবার হাই তুলল টমি।জিভ আর টাকরার সাহায্যে অদ্ভুত আঁ-ম আঁ-ম শব্দ করল।চোখে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।একটা চেয়ারে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল।মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল একবার পুলের দিকে।ছেলেদের দিকে ফিরল। বসবে কি বসবে না, দ্বিধা করছে।

অবশেষে ধপ করে পাথুরে চত্বরেই বসে পড়ল।গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলে নিল পাজামার নিচের দিকটা।তারপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসল।

ভঙ্গিটা চেনে কিশোর।যোগ ব্যায়ামের একটা আসন, পদ্মাসন।গুড মর্নিং, আবার বলল সে।

ফ্যাকাসে মুখটা কিশোরের দিকে ফেরাল টমি।পুরো এক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোখের কোন নির্দিষ্ট রঙ বোঝা যাচ্ছে না।মণির চারপাশের সাদা অংশটা টকটকে লাল, ঘুমিয়ে ছিল, কিন্তু ঘুম ভাল হয়নি যেন!

এখনও সকালই রয়েছে? অবশেষে কথা বলল টমি।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল কিলোর।না, তা নেই।একটা বেজে গেছে।

আবার হাই তুলল টমি।

মিস্টার অলিভারের কাছে শুনলাম, আপনি ভারমন্টের একটা নাইটশপে কাজ করেন? বলল কিশোর।

সামান্য সতর্ক মনে হল টমিকে।মৃদু হাসল।মাঝরাত থেকে সকালতক।খুব খারাপ সময়। তবে ভাল পয়সা দেয় ওরা।ওই সময়টীর জন্য আলাদা ভাতা দেয়।কাজেই ছাড়ি না। তাছাড়া সারাদিন আর রাতের অর্ধেকটা সময়ই থাকে আমার।পড়াশোনা করতে পারি।

স্কুলে পড়েন? জানতে চাইল কিশোর।

মুখ বাঁকাল টমি, হাত নাড়ল বিশেষ ভঙ্গিতে, যেন স্কুলে যাওয়াটা বেহুদা সময় নষ্ট।বহু আগেই ওই পাট চুকিয়েছি।বাপ চেয়েছে, আমি কলেজে যাই।তারপর ডেন্টিস্ট হই।কোন

মানে খুঁজে পেলাম না এর।কে যায়, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে।লোকের মাড়ি খোঁচাখুঁচি করতে? আসলে, ও-সবই এক ধরনের মোহ, মায়া।

মোহ! বিড়বিড় করল মুসা।

হা।সবই মোহ।পুরো দুনিয়াটাই একটা মায়া।সবাই আসলে ঘুমে অচেতন আমরা, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছি।ব্যাপারটা বুঝে গেছি আমি।তাই জেগে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছি।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল রবিন আর মুসা।মনের ভাব, মাতাল নয় তো ব্যাটা?

কি নিয়ে পড়াশোনা করছেন? জিজ্ঞেস করল কিলোর।

ধ্যানতত্ত্ব, বলল টমি।পূর্ণ-সচেতনতায় পৌঁছতে হলে এর ব্যাপক চর্চা দরকার।আসনমুক্ত হয়ে দাঁড়াল সে।ছেলে তিনটেকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকতে দেখে মজা পাচ্ছে।

টাকা জমাচ্ছি, আসরের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে টমি। ভারতে যাব গুরু খুঁজতে।ধ্যানতত্ত্বের সবচেয়ে বড় শিক্ষক একমাত্র ভারতেই আছে।তাই কষ্ট হলেও রাতে কাজ করি, বেশি টাকার জন্যে।শিগগিরই বেশ কিছু টাকা জমে যাবে আমার, ভারতে গিয়ে তিন-বছর থাকার মত হয়ে যাবে।ধর্ম আমি বিশ্বাস করি না, বিজ্ঞান মানি না।কোন জিনিসে আমার লোভ নেই।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে রবিন।তা থাকেও না–চাওয়ার যা যা আছে, সব জিনিস যদি থাকে কারও–

না, না! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল টমি।বুঝতে পারছ না–

বোঝার দরকার আছে বলেও মনে হয় না! ফস করে বলে ফেলল মুসা।

খুব সহজ ব্যাপার, মুসার টিপ্পনীতে কান দিল না টমি। চাহিদা, লোভ থেকেই সব গোলমালের সৃষ্টি। ওই যে বুড়ো অলিভার, সারাক্ষণ খালি নিজের সংগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত। আরও চাই, আরও চাই এই-ই করছে খালি।পরের জন্মে–আমার মনে হয়, পরের জন্মে ভাঁড়ারের ইঁদুর হয়ে জন্মাবে!

কি যা-তা বলছেন ভদ্রলোক সম্পর্কে রেগে গেল মুসা।ওঁর মত মানুষ হয় নাকি?

মুসার বোকামিতে হতাশ হল যেন খুব, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল টমি।কারও কাছ থেকে চুরি করে কিংবা ছিনিয়ে এনেছে বা আনছে, তা বলিনি।বলছি, এত আছে, আরও চাইছে কেন? কেন বুঝতে পারছে না, মরীচিৎকার পেছনেই ছুটছে শুধু? জান, ওর কাছে মহামূল্যবান একটা মান্দালা আছে, অথচ জানেই না ওটা কি করে ব্যবহার করতে হয়। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে, যেন আরেকটা অতি সাধারণ চিত্র।

মান্দালাটা আবার কি জিনিস? ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

প্রায় ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল টমি।সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল আবার।হাতে ছোট একটা বই।ছেলেদের কাছে এসে বলল, ওরকম একটা মান্দালা আমার খুবই দরকার।এক ধরনের নকশা, মহাবিশ্বের।ওটার ওপর চোখ রেখে ধ্যান করলে মেকি দুনিয়ার সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যাবে তুমি, সৌরজগৎ কিংবা আরও বড় কোন জগতের একজন হয়ে পড়বে।বই খুলে রঙিন একটা ছোট নকশা দেখাল সে।বেশ কয়েকটা ত্রিভুজ একটার ওপর আরেকটা ফেলে তারকা তৈরি করা হয়েছে।ওটাকে ঘিরে রেখেছে ছোটবড় অনেকগুলো বৃত্ত।সবচেয়ে বড় বৃত্তটাকে ছুঁয়ে আঁকা হয়েছে একটা চতুর্ভুজ।এটা একটা মান্দালা।

কই, মিস্টার অলিভারের ঘরে তো এ ধরনের জিনিস দেখিনি! বলল মুসা।

আছে। আমারটার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। তিব্বত থেকে এসেছে। অনেক পুরানো দেবদেবীর ছবি আছে ওটাতে, বই বন্ধ করল টমি।ওরকম একটা জিনিস জোগাড় করবই আমি।কোন গুরুকে দিয়ে আঁকিয়ে নেব।এখন টেলিভিশন দিয়েই কাজ চালাই।

টেলিভিশন! রবিন অবাক।

হ্যাঁ, টেলিভিশন, আবার বলল টমি।বর্তমানের সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হতে সাহায্য করে আমাকে। দোকানের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরি।তারপর খুলে দিই টেলিভিশন, সাউণ্ড বন্ধ করে রাখি।শুধু ছবি।প্রথমে পর্দার ঠিক মাঝখানে দৃষ্টি স্থির।করি, ধীরে ধীরে সরিয়ে নিই কোন এক কোনার দিকে। পর্দায় কি ঘটছে না ঘটছে, কিছু চোখে পড়ে না আর। রঙের প্রতিকৃতিগুলোর দিকে চেয়ে থাকি শুধু।একসময় হারিয়ে যাই অদ্ভুত এক জগতে, সেটাই আসল জগৎ।

ঘুমিয়ে পড়েন নিশ্চয়! মন্তব্য করল রবিন।

অপ্রতিভ মনে হল টমিকে।ধ্যানমগ্নতার-হ্যাঁ, ধ্যানমগ্নতার এটাই অসুবিধে! স্বীকার করল সে।মাঝে মাঝে এত বেশি শান্ত হয়ে যায় মন, ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্ন দেখি তখন.. বাধা পেয়ে থেমে গেল টমি।

দরজায় শব্দ।বেরিয়ে এসেছেন মিস্টার অলিভার।চেয়ে আছেন তিন গোয়েন্দার দিকে।

দুঃখিত, বলে উঠল কিশোর।আপনার সব কথা শোনা হল না।আমাদেরকে যেতে হচ্ছে।

না না, দুঃখিত হবার কিছু নেই, তাড়াতাড়ি বলল টমি।যখন খুশি, যে সময় খুশি, আমার ঘরে এস।যদি তখন ধ্যানে না বসি, কথা বলব।এ-সম্পর্কে, মান্দালা সম্পর্কে যা জানতে চাও, জানাব।..আর হ্যাঁ, আমার ভারতে যাবার ব্যাপারেও বলব...

ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে রওনা হল তিন গোয়েন্দা।

ঘরে ঢুকেই বড় নিচু একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন অলিভার।

আরেকটা চাবি আছে মিসেস ডেনভারের কাছে, না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হ্যাঁ, আছে, মাথা ঝোঁকালেন অলিভার।ঠিকই অনুমান করেছিলে তুমি, আরেকটা চাবি আছে কারও কাছে।নাকা বুড়ি! উকিলকে ডেকে ওর চাকরির চুক্তিপত্রে আরও কিছু শর্ত ঢোকাব আমি।এরপর থাকলে থাকবে, না থাকলে চলে যাবে।

চাবিটা জোগাড় করল কোথা থেকে? জানতে চাইল রবিন।

খুব সহজে।মাস দুই আগে ইউরোপে গিয়েছিলাম।পরিচিত এক চাবিঅলাকে ডেকে আনল বুড়ি।বলল, এ-ঘরের তালার চাবি হারিয়ে ফেলেছে, আরেকটা চাবি বানিয়ে নিতে হবে। ম্যানেজার বলছে, কাজেই কোনরকম সন্দেহ করল না চাবিঅলা।বানিয়ে দিল আরেকটা চাবি।

আজব মহিলা! বিড়বিড় করল কিশোর।

আজব? মুখ বাঁকালেন অলিভার।আমার তো মনে হয় মাথায় গোলমাল আছে! যাক, রহস্যটার সমাধান হয়ে গেল।ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করত কে, বোঝা গেল।আর ঢুকতে পারবে না।চাবিটা নিয়ে নিয়েছি ওর কাছ থেকে।আর একটা বানিয়ে নেবার সাহস হবে না, খুব ধমকে দিয়েছি।তোমরা আমার মস্ত উপকার করলে, হেসে যোগ করলেন, জেনে ভাল লাগছে, ভূত-ফুত কিছু না, রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষই ঘরে ঢুকত।ছায়া দেখাটা আসলে কল্পনা, এখন বুঝতে পারছি। ওই তামারা ব্রাইসের ভূতের গল্পই শেকড় গেড়েছিল মনে! আর কিছু না! কি বোকামিই করেছেন এতদিন ভেবে, আপনমনেই মাথা নাড়লেন তিনি।

অলিভারের কথা কিশোরের কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না।আপনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে চলেছে সে।হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল।হাসল বৃদ্ধের দিকে চেয়ে।যাক, রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।আপনার উপকার করতে পেরেছি, খুব ভাল লাগছে।উঠে দাঁড়াল।আচ্ছা, মিস্টার অলিভার, আপনার কাছে কি একটা মান্দালা আছে?

তুমি জানলে কি করে? ভুরু কুঁচকে গেছে অলিভারের।কেন, দেখতে চাও?

মাথা ঝোকাল কিশোর।

গোয়েন্দাপ্রধানকে নিয়ে এসে কাজের ঘরে ঢুকলেন অলিভার।ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা বিচিত্র নকশা ঝুলছে ডেস্কের ওপরে, দেয়ালে। উজ্জ্বল রঙে আঁকা।টমির কাছে যেটা রয়েছে, অনেকটা ওটার মতই।তবে অনেক বড়।আর, বৃত্তগুলো।ঘেঁষে খুদেখুদে অক্ষরে প্রাচীন দুর্বোধ্য কোন ভাষায় লেখা রয়েছে কি যেন।চার কোণে অনেকগুলো দেব-দেবীর ছবি।

এক তরুণ আর্টিস্টের কাছ থেকে কিনেছি, বললেন অলিভার।দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত সে।তিব্বত থেকে এনেছে মান্দালাটা।ওর জন্যেই নাকি বানিয়ে দিয়েছিল এক গুরু।এটা অনেক দিন আগের কথা।আর্টিস্ট এখন নেই, মারা গেছে।

মিস্টার অলিভার, গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।এ ঘরে টমি গিলবার্ট ঢুকেছিল?

না-তো, ভুরু কোঁচকালেন অলিভার।ওই নাকা বুড়িটা ছাড়া এ-বাড়ির আর কেউ ঢোকেনি এ ঘরে।একা থাকতে পছন্দ করি আমি, জানই।আচ্ছা ভাল লাগে না।আর টমিটাকে ঢুকতে দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না।সারাদিনই কেমন যেন।মাতাল মাতাল একটা ভাব, অপরিষ্কার, গন্ধ বেরোয় চুল থেকে।

তা ঠিক, একমত হল কিশোর।ওই মান্দালাটা বাইরে বের করেছিলেন কখনও? ফ্রেম-ট্রেম ঠিক করার জন্যে?।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অলিভার।গত দশ বছর ধরে ওখানে ওভাবেই ঝুলে আছে ওটা।বছর বছর দেয়ালে রঙ দেবার সময় শুধু নামাই, তা-ও নিজের হাতে।আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখি সে-সময়টা।রঙের কাজ শেষ হলে আবার ঝুলিয়ে দিই।কেন?

টমি জানল কি করে আপনার কাছে একটা মান্দালা আছে?

জানে?

জানে।এ-ও জানে, ওটা তিব্বতের জিনিস।ওর কাছে একটা মান্দালা আছে।

কাঁধ ঝাঁকালেন অলিভার।কি জানি! ওই হতচ্ছাড়া খবরের কাগজঅলাদের কাজ হবে হয়ত! আমার সংগ্রহে কি কি আছে, ছেপে বসেছিল হয়ত কখনও।কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব জানে, কি আছে আমার সংগ্রহে। ওরাই হয়ত কেউ জানিয়েছিল খবরের কাগজঅলাদের।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোকাল কিশোর।দরজার দিকে এগোল।

কিশোর, হালকা গলায় বললেন অলিভার।আরেকটা রহস্য খুঁজছ? লাভ নেই।আর কোন রহস্য নেই এখানে।

হয়ত, একমত হতে পারছে না গোয়েন্দাপ্রধান।না থাকলেই ভাল।কিন্তু আবার কোন কিছু ঘটতে আরম্ভ করলেই ডেকে পাঠাবেন আমাদের, দ্বিধা করবেন না।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

তিন গোয়েন্দার সঙ্গে একে একে হাত মেলালেন অলিভার।দরজার বাইরে এগিয়ে দিয়ে এলেন ওদের।

রাস্তায় এসে নামল তিন ছেলে।

গেল শেষ হয়ে! বাস-স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা।এত সহজ কেস আর হাতে আসেনি।ছুটির বাকি দিনগুলো কি করে কাটাব?

প্রথম কাজ, পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে দূরে থাকব, বলে উঠল রবিন। মেরিচাচীর আইসক্রীম কেকের লোভ এবারের মত ত্যাগ করতে হবে।আরিব্বাপরে, যা জঞ্জাল এনে জমিয়েছেন রাশেদ চাচা।সাফ করতে... ইঙ্গিতে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিল গবেষক।কিশোর, তুমি কি বল?

আঁ-হা! জবাব দিল কিশোর।সঙ্গীদের কথায় মন নেই।গভীর চিন্তা চলেছে তার মাথায়।

সারাটা পথ চুপচাপ থাকল কিশোর।জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে রইল।

রকি বীচে পৌঁছুল বাস।নামল তিন গোয়েন্দা।পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে হেঁটেই চলে এল। কিশোরের কাছ থেকে বিদায় নিল অন্য দুজন।

টেলিফোনের কাছাকাছি থেক, ডেকে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। শিগগিরই আবার কাজে নামতে হবে।মিস্টার অলিভারের কাছ থেকে ডাক এল বলে।

বিস্মিত দুই সঙ্গীর দিকে চেয়ে হাসল কিশোর।হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে রওনা হয়ে গেল ইয়ার্ডের দিকে।

.

০৭.

একগাদা লোহা-লক্কড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচী।কিশোরকে দেখেই মুখ তুলে তাকালেন।এসেছিস! তুই কি, বল তো কিশোর! মানুষকে ভাবনায় ফেলে।দিয়ে মজা পাস! বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে সেই সক্কাল বেলা বেরিয়ে চলে গেছিস! বালিশের ওপর একটা চিঠি ফেলে রেখে গেলেই হল? কেন, বলে যেতে কি অসুবিধে ছিল...।

ঘুমিয়েছিলে, বলল কিশোর, জাগাতে চাইনি...

দরদ! এই সারাটাদিন দুঃশ্চিন্তায় ভোগানর চেয়ে ঘুম ভাঙানো অনেক ভাল ছিল।তোরা চাচা-ভাতিজা মিলে আমাকে জ্বালিয়ে খেলি। তুই থাকবি বাইরে বাইরে, টো টো করে ঘুরবি, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবি।কার বেড়াল হারাল, কার কুকুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তাতে তোর কি?...আর তোর চাচা, রাজ্যের যত জঞ্জাল এনে ফেলবে আমার ঘাড়ে! এগুলো না হয় বিক্রি, না কিছু, খালি জায়গা আর সময় নষ্ট।টাকাও!

হাসল কিশোর, ভেব না, চাচী।সারাটা বিকেল পড়ে রয়েছে।আজই সাফ করে ফেলব সব। এখন খেতে দাও তো, খুব খিদে পেয়েছে।

ভুরু কোঁচকালেন মেরিচাচী।সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি! আয়, জলদি আয়! হাত মুখ ধুয়ে নে-গে।আমি খাবার বাড়ছি।তাড়াহুড়ো করে জঞ্জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।বাড়ির দিকে চললেন।

জঞ্জালের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। হাসিতে ভরে গেছে মুখ। প্রচুর জিনিস বেরোবে ওগুলোর ভেতর থেকে, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ঢোকাতে পারবে। কাজে লাগবে তিন গোয়েন্দার।

পুরো বিকেল জঞ্জাল ঘটল কিশোর। সন্ধে ছটায় চলল ঘরে, রাতের খাবার খেতে। এর ঠিক এক ঘণ্টা পরে বাজল ফোন।

ফোন ধরলেন মেরিচাচী। কিশোরের দিকে চেয়ে বললেন, তোর ফোন।

চকচক করে উঠল কিশোরের চোখ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রায় ছুটে এসে ধরল ফোন। কানে ঠেকাল রিসিভার। কিশোর পাশা।

কিশোর, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ। আমি ফ্র্যাঙ্ক অলিভার। কিশোর, বললে বিশ্বাস করবে না আমার, আমার ঘরে আবার ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে

বলুন, শান্ত গোয়েন্দাপ্রধান।

মিসেস ডেনভারকে ধরার পর ভেবেছিলাম, ছায়ার ব্যাপারটা আমার কল্পনা, বললেন অলিভার। কিন্তু তা নয়! আবার দেখেছি আমি ছায়াটা! মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল কিনা, বুঝতে পারছি না!

আপনার বাড়িতে আসতে বলছেন আমাদেরকে?

প্লীজ! যদি আজই পার, খুব ভাল হয়। রাতটা আমার এখানেই কাটাবে। একা থাকতে খুব খারাপ লাগছে। যে-কোন সময় আবার এসে পড়বে ছায়াটা...সইতে পারব না আর! নার্ভের ওপর খুব চাপ পড়ছে!

ঠিক আছে, আমরা আসছি, যত তাড়াতাড়ি পারি, রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

আবার ভাগার তালে আছিস? গম্ভীর হয়ে গেছেন মেরিচাচী।

সব কথা খুলে বলল কিশোর। বুঝিয়ে বলল চাচীকে।

তাই! সব শুনে বললেন চাচী। আহা, মানুষটার জন্যে খারাপই লাগছে! বিয়ে। করল না, সঙ্গীসাথী নেই, একা মানুষ, কাটায় কি করে! ঠিক আছে, যা। বাসে যাবার দরকার নেই। তোর চাচাকে বলছি, গাড়িতে করে দিয়ে আসবে।

চাচীকে জড়িয়ে ধরল কিশোর। টুক করে তার গালে চুমু খেয়ে বলল, এ জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি, চাচী!

মুসা আর রবিনকে টেলিফোন করল কিশোর।

কয়েক মিনিট পরেই ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল ছোট পিক-আপ ট্রাকটা। পেছনে গাদাগাদি করে বসেছে তিন গোয়েন্দা।

কিশোর, আবার তোমার কথাই ঠিক হল, ঠেলেঠুলে দুই বন্ধুর মাঝখানে আরেকটু জায়গা করে নেবার চেষ্টা চালাল মুসা।কি করে জানলে, আবার খবর দেবেন, মিস্টার অলিভার?

কারণ, আমি শিওর, ছায়া দেখাটা ওঁর কল্পনা নয়।আমি নিজেও দেখেছি।ওটা?

তুমি দেখেছ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন।কখন?

গতকাল।মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে।একটা বুকশেলফের পাশে।প্রথমে মনে করেছি, মুসা এসে দাঁড়িয়েছে।কিন্তু পরে জানলাম, ও তখন বসার ঘরে ছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বলে উঠল মুসা।কিন্তু পরে যে বললে, বুকশেলফের ছায়া?

তখন তাই মনে করেছিলাম।এটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল।কিন্তু টমি গিলবার্টকে দেখার পর...

চমকে উঠেছিলে! কিশোরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন।গতকাল পুলিশ আসার পর ঘর থেকে বেরিয়েছিল টমি।তাকে দেখেই কেমন চমকে উঠেছিলে তুমি।

হ্যাঁ।একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, মুসার সমানই লম্বা সে? বলল কিশোর।

দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাড়াতাড়ি বলল মুসা।ওর মত দেখতে নই আমি।ও আমার চেয়ে বড়, বিশের কম হবে না বয়েস।তাছাড়া হাড্ডিসার...

আমি বলেছি টমি তোমার সমান লম্বা, বাধা দিয়ে বলল কিশোর।তোমার।কালো চুল, ওরও।ও গতরাতে কালো সোয়েটার পরেছিল, তোমার গায়ে ছিল।কালো জ্যাকেট।মিস্টার অলিভারের কাজের ঘরে তখন ম্লান আলো জ্বলছিল।ঘরের বেশির ভাগই ছিল অন্ধকার। টমিকে তুমি বলে ভুল করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখছে মনে মনে।

কিন্তু ও ঢুকল কি করে? অবশেষে বলল রবিন।দরজায় তালা দেয়া ছিল।

জানি না, মাথা নাড়ল কিশোর।টমিকেই দেখেছি, সেটাও শিওর হয়ে বলতে পারছি না। তবে, কেউ একজন ঢুকেছিল।কি করে ঢুকেছিল, এটা জানতে পারলেই অনেক কিছু সহজ হয়ে যাবে।

ঘন্টাখানেকের ভেতরই প্যাসিও প্লেসে পৌঁছে গেল পিক-আপ। চত্বরের সামনে তিন গোয়েন্দাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন রাশেদ চাচা।

বেল টিপল কিশোর।

এসে পড়েছ! দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার অলিভার।গুড।সত্যি বলছি, ভয়ই পেতে শুরু করেছি আমি!

বুঝতে পারছি, মাথা ঝোঁকাল কিশোর।ঘরটা ঘুরেফিরে দেখি? ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল সে।

মাথা কাত করলেন মিস্টার অলিভার।

প্রথমেই সোজাঁ কাজের ঘরের দিকে ছুটে গেল কিশোর।কোণের দিকে ডেস্কের ওপর জলছে শুধু টেবিল ল্যাম্পটা।ঘরে আলো-আঁধারির খেলা।পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু একটা বুকশেলফের একপাশের কয়েকটা বই, চীনামাটির তৈরি কয়েকটা মূর্তি, আর দেয়ালে ঝোলানো মান্দালা।ভুরু কুঁচকে নকশাটার দিকে চেয়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ, গত বিকেলের মতই উপলব্ধি করল, ঘরে একা নয় সে।আরও কেউ একজন রয়েছে। নীরবে লক্ষ্য করছে তাকে।পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর।

গত দিন যেটার কাছে দেখেছিল, সেখানেই আজও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ছায়াটাকে।সে ফিরে তাকাতেই কোণের দিকে সরে যেতে লাগল দ্রুত।বাতাসে জানালার পর্দা কাঁপার মত কাঁপছে থিরথির করে।

লাফ দিয়েই ছুটল কিশোর।ঘরের কোণে এসে খামচে ধরার চেষ্টা করল।ছায়াটাকে।হাতে ঠেকল দেয়াল, শুধুই দেয়াল।ছুটে এসে সুইচ টিপে মাথার ওপরের তীব্র আলো জ্বেলে দিল।পাগলের মত তাকাল চারদিকে।নেই।কোথাও নেই ছায়াটা।

ছুটে কাজের ঘর থেকে বেরোল কিশোর।সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে।নিচে তাকাল।

উজ্জ্বল ফ্লাডলাইট জ্বলছে।নীল-সাদা আলোয় জ্বলজ্বল করছে সুইমিং পুলের সোনালি আর নীল মোজাইক করা তল।পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে টমি গিলবার্টের ফ্ল্যাটটা।জানালার পর্দা সরানো।রঙিন আলোর আবছা ঝিলিক চোখে পড়ছে, তার মানে টেলিভিশন খোলা।দেখা যাচ্ছে টমিকে।চুপচাপ মেঝেতে বসে আছে সে, পদ্মাসনে, বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা।

কি হল? কানের কাছে ফিসফিস করল রবিনের কণ্ঠ।

আবার দেখেছি ওটা! বিড়বিড় করল কিশোর।কেঁপে উঠল একবার।কিছু না, ডিসেম্বরের ঠাণ্ডার জন্যেই এই কাঁপুনি নিজেকে প্রবোধ দিল সে।কাজের ঘরে–মান্দালাটার দিকে চেয়ে ছিলাম।হঠাৎ টের পেলাম, আরও কেউ রয়েছে ঘরে।ঘুরে তাকালাম।দেখলাম ছাঁয়াটাকে।এখন মনে হচ্ছে, টমি নয়।ওই যে টমি, তার ঘরে, বসে বসে ঝিমোচ্ছে।কিন্তু ঢুকল কি করে ছায়া! বেরিয়েই বা গেল কি করে! আশ্চর্য!

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর।দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন অলিভার।

ওকে তুমিও দেখছ, না? কম্পিত কণ্ঠ বৃদ্ধের।তারমানে, পাগল হয়ে যাইনি আমি!

নীরবে ঘরে ঢুকে গেল ছেলেরা।দরজা বন্ধ করে দিল।

না, মিস্টার অলিভার, বলল কিশোর, পাগল হয়ে যাননি! গতকালও দেখেছি ওটা আমি। কি মনে হয় আপনার? টমি গিলবার্টের সঙ্গে কোন মিল রয়েছে?

জানি না!–এত দ্রুত আসে-যায় ছায়াটা! খামোকা কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তবে-তবে, টমির সঙ্গে মিল আছে!

কিন্তু তাই বা কি করে হয়? আপনমনেই বলল কিশোর।দুই দুই বার ওটা দেখেছি, দুবারই টমি ছিল তার ঘরে।একই সঙ্গে দুটো জায়গায় কি করে যাবে সে? জোরে জোরে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। না, হতে পারে না!–মিস্টার অলিভার, টমি সম্পর্কে কতখানি জানেন আপনি?

খুবই সামান্য, বললেন অলিভার।মাস ছয়েক হল, আমার বাড়িতে ভাড়া এসেছে সে।

টমি আসার আগে কি ওই ছায়ার উপস্থিতি টের পেয়েছেন কখনও?

ভাবলেন অলিভার।মাথা নাড়লেন।না।ব্যাপারটা নতুন।

আপনার মান্দালার ওপর লোভ আছে ওর, বলল কিশোর।ভাল করে ভেবে দেখুন তো, ওটার কথা কখনও বলেছেন কিনা ওর কাছে?

কক্ষনও না, সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন অলিভার।ওর সঙ্গে পারতপক্ষে কথা বলি না আমি এড়িয়ে চলি।তবে মাঝেমধ্যে লারিসার সঙ্গে কথা বলি।মেয়েটা ভারি মিশুক।তবে সে-ও খুব একটা মিশতে চায় না টমির সঙ্গে। মোটা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আতঙ্ক রয়েছে মেয়েটার।রোজ রাতে নিয়মিত সাঁতার কাটে পুলে।অনেক সময় পুলের কাছে বসে থাকে টমি।মেয়েটা উঠে এলে তার সঙ্গে আলাপ জমানর চেষ্টা করে।কিন্তু পাত্তা দেয় না লারিসা। আমাকে বলেছে, ছেলেটাকে দেখলেই কেমন একটা অনুভূতি হয়-বিছে, মাকড়সা কিংবা কেঁচো দেখলে যেমন হয় কারও কারও!।

এ-বাড়ির কোথাও কোন গোপন পথ নেই তো? বলল রবিন।আপনার ঘরে ঢোকার?

মনে হয় না, অলিভারের হয়ে জবাব দিল কিশোর।এসব আধুনিক বাড়িতে গোপন পথ বানায় না লোকে।সেসব ছিল আগের দিনে, দুর্গ-টুর্গগুলোতে।

সন্দেহ থাকলে খুঁজে দেখতে পার, বললেন অলিভার।আমার বাবা আরেকজনের কাছ থেকে কিনেছিলেন এ-বাড়ি।পুরানো আমলের লোক ছিল আগের মালিক।বলা যায় না, যদি তেমন কোন পথ বানিয়ে রেখে গিয়ে থাকে।

তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা।বিশেষ করে কাজের ঘরে।কিন্তু গোপন পথ তো দূরের কথা, ইঁদুর বেরোনর মত বাড়তি একটা ফোকরও নেই দরজা-জানালা ভেন্টিলেটর আর পানি নিষ্কাশনের সরু ছিদ্র ছাড়া।দেয়াল বা মেঝের কোথাও কোন ফাঁপা জায়গা নেই।দরজা ছাড়া আর কোন পথে মানুষের ঢোকার উপায় নেই।

সত্যিই আশ্চর্য! অবশেষে বলল রবিন।

মাথা ঝোঁকালেন অলিভার।বহু বছর ধরে আছি এ-বাড়িতে।আরও কয়েকটা বাড়ি আছে আমার, কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি পছন্দ।তাই এখান থেকে নড়ি না।তবে এবার বোধহয় তল্পি গোটাতেই হল।এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা এভাবে ঘটতে থাকলে পাগলই হয়ে যাব!

এরপর ঘাপটি মেরে কাজের ঘরে বসে রইল তিন গোয়েন্দা।কিন্তু আর এল ছায়াটা।রাত বাড়ছে। শেষে ওঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। শোবার ঘরে শুয়ে। শুয়ে বই পড়ছেন অলিভার।কোনরকম শব্দ হলেই চমকে উঠছেন।তাকে জানাল কিশোর, সারারাত পাহারা দেবে ওরা পালা করে।তিনি যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

বসার ঘরে সোফার ওপর রাত কাটাবে রবিন।মুসা থাকবে কাজের ঘরে।একটা কাউচে। কিশোর অন্য কোন একটা ঘরে শুতে পারবে।

রাতের প্রথম প্রহরে পাহারায় রইল কিশোর।সদর দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল সে।কান খাড়া রাখল।

এগারোটা বাজল। নিথর নীরব চারদিকটা। শোনার মত তেমন কিছুই নেই। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার শব্দও থেমে গেছে অনেক আগেই।এই সময় কানে এল।পানিতে ঝুপঝাঁপ শব্দ।নিশ্চয় লারিসা ল্যাটনিনা সাঁতার কাটতে নেমেছে।স্বাস্থ্যের প্রতি কি দৃষ্টি! কনকনে ঠাণ্ডায় এই মাঝরাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম করেনি।

কিশোর? কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মুসা।জলদি এস! একটা জিনিস দেখবে!

উঠে পড়ল কিশোর।রবিন ঘুমিয়ে পড়েছে।মুসাকে অনুসরণ করে কাজের ঘরে চলে এল সে।জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।গির্জার ভেতরে আলো!

বোধহয় ফাদার স্মিথ, বলল কিশোর।ঠিকঠাক আছে কিনা সব, দেখতে এসেছেন!

কিন্তু এত রাতে!

ঠিকই বলেছ, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কিশোর।সন্দেহজনকই! দাঁড়াও, দেখে আসছি।

আমি আসি তোমার সঙ্গে, বলল মুসা।

না, জোর দিয়ে বলল কিশোর।তুমি এখানেই থাক।পাহারা দাও।আমি যাব আর আসব।

বসার ঘরে চেয়ার থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল কিশোর।দরজা খুলে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে। চত্বরের আলো নিবে গেছে। নির্জন, শূন্য। সুইমিং পুলেও কেউ নেই। কেঁপে উঠল একবার কিশোর, বোধহয় ঠাণ্ডার জন্যেই।দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে।

রাস্তায় এসে নামল কিশোর।গির্জার জানালায় আলোটা দেখা যাচ্ছে এখনও।ঘষা কাঁচের শার্সিতে ঘোলা প্রতিফলন।কাঁপছে অল্প অল্প।বৈদ্যুতিক আলো নয়!

গির্জার সদর-দরজা বন্ধ।সিঁড়ি বেয়ে পাল্লার কাছে উঠে এল কিশোর।আস্তে করে ঠেলা দিল।ভেজানই রয়েছে পাল্লা।খুলে গেল নিঃশব্দে।ভেতরে ঢুকে গেল সে।

পেছন ফিরে একটা বেদির কাছে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা।কালো আলখেল্লা।সাদা কলার। হাতে মোমবাতি।

শব্দ শুনে ঘুরল মূর্তি।স্থির হয়ে গেল কিশোর।পাদ্রীর পোশাক পরা একজন।মানুষ।বৃদ্ধ। লম্বা লম্বা চুল সব সাদা।গাল আর কপালের চামড়া কোঁচকানো।

কথা বলল না লোকটা।হাতের মোমবাতি তুলে নীরবে দেখছে কিশোরকে।

মাপ করবেন, ফাদার, কাঁপা গলায় বলল কিশোর, বাইরে থেকে আলো দেখলাম।চোরের উৎপাত রয়েছে তো।তাই দেখতে এসেছি।(অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা।তারপর হাত দিয়ে বাতাস করে নিবিয়ে।দিল মোম।গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ঘরটাকে।

ফাদার! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।ঘাড়ের কাছে লোম খাড়া হয়ে গেছে তার।মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত।পিছিয়ে এল এক পা।বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

পাশ দিয়ে দমকা হাওয়ার মত ছুটে গেল কিছু একটা।জোর ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল কিশোর।পরক্ষণেই পেছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ভারি দরজা।

কালিগোলা অন্ধকার।হুড়মুড় করে আবার উঠে পড়ল কিশোর।হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল দরজার হাতল।টান দিল।

ইঞ্চিখানেক ফাঁক হল পাল্লা, তার বেশি না।কিসে যেন আটকে গেছে! জোরে ঠেলা দিয়েই আবার হ্যাঁচকা টান দিল কিশোর।আবারও সেই এক ইঞ্চি ফাঁক।

বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়া হয়েছে দরজায়।

.

০৮.

দরজার পাশে দেয়াল হাতড়াচ্ছে কিশোর।হাতে ঠেকে গেল সুইচ বোর্ড।একটার পর একটা সুইচ টিপে গেল সে।উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল মাথার ওপর।আলোয়।ভরে গেল বিরাট ঘর।

দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল কিশোর।ধীরে ধীরে ডান থেকে বায়ে সরাল নজর।কেউ নেই।আস্তে করে এগোল।এসে থামল, খানিক আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটা সেখানে।মেঝেতে পড়ে আছে কয়েক ফোঁটা মোম।

আবার দরজার কাছে ফিরে এল কিশোর।হাতল ধরে টান দিল।খুলল না।মনে হয়, বিড়বিড় করল সে আপনমনেই, ডাকার সময় হয়েছে! চৌকাঠ আর পাল্লার ফাঁকে মুখ রেখে চেঁচাতে শুরু করল সে, কে আছেন! আসুন! আমি আটকে

গেছি! কে আছেন–চুপ করল।কান পাতল! কোন আওয়াজ নেই।দরজার গায়ে।জোরে জোরে চাপড় দিতে লাগল।মুসা! ফাদার স্মিথ! আমি আটকে গেছি!

জবাব নেই।

অপেক্ষা করল কিশোর, তারপর আবার চেঁচাল।আবার অপেক্ষার পালা।

ওখানে যাওয়া উচিত হবে না, ফাদার! শোনা গেল একটা মহিলাকণ্ঠ।

খামোকা ভয় পাচ্ছ, ব্রাইস, ফাদার স্মিথের গলা চিনতে পারল কিশোর।একা যাচ্ছি না আমি।পুলিশে ফোন করেছি।যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে-..

ফাদার স্মিথ! চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।আমি কিশোর পাশা! তালা দিয়ে।আটকে রেখে গেছে আমাকে!

কিশোর পাশা? বাইরে দরজার কাছেই শোনা গেল ফাদারের বিস্মিত কণ্ঠ।

উইলশায়ারের দিক থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। বুঝে গেছে, পুলিশ আসার আগে তালা খুলবেন না ফাদার। পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা তার বিশেষ সুখকর হবে না, এটাও বুঝতে পারছে।গির্জার ভেতরে চোখ বোলাতে বোলাতে কুটি করল সে।

কাছে, আরও কাছে এসে গেল সাইরেনের শব্দ।থেমে গেল হঠাৎ।

তালায় চাবি ঢোকানর শব্দ হল।খুলে গেল দরজা।

শোবার পোশাক পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার স্মিথ।তার পাশে মিসেস ব্রাইস। ঘাড়ের ওপর নেমেছে চুল, তাড়াহুড়ো করে বেঁধেছে, দেখেই বোঝা যায়।

একটু সরুন, প্লীজ, ব্রাইসের পেছন থেকে বলল একজন পুলিশ।

বাঁ পাশে এক পা সরল ব্রাইস।তরুণ পেট্রলম্যানের চোখে চোখ পড়ল কিশোরের।আগের রাতে গির্জায় চোর খুঁজতে যারা যারা এসেছিল, এই লোকটাও তাদের একজন।পাশে আরেকজন, হাতে রিভলভার।

কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল তরুণ অফিসার।

আঙুল তুলে দেখাল কিশোর, যেখানে পাদ্রীর পোশাক পরা লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।গির্জার ভেতরে আলো জ্বলতে দেখলাম।এতরাতে কে ঢুকল, দেখতে এলাম। দেখি, ফাদারের পোশাক পরা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে ওখানটায়, হাতে মোম।আমাকে দেখেই আলো নিবিয়ে দিল।অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বেরিয়ে চলে গেল।তালা আটকে দিল দরজায়।

দেখতে এসেছিলে? বলল আরেক অফিসার।

হ্যাঁ।মিস্টার অলিভারের ঘরের জানালা থেকে দেখেছি, গির্জায় আলো।

ও, হা হা, মনে পড়েছে, বলে উঠলেন ফাদার।সকালে মিস্টার অলিভারের সঙ্গে দেখেছি তোমাকে।কিন্তু এত রাতে এখানে এক পাদ্রীকে দেখেছ! সেই সন্ধ্যা ছটায় আমি নিজে তালা লাগিয়ে গেছি দরজায়।আমি ছাড়া আর কোন ফাদার নেই এখানে।নিশ্চয় ভুল করেছ।

না করেনি! চেঁচিয়ে উঠল ব্রাইস।ফাদার, আপনি জানেন ও ভুল করেনি!

আহ্, আবার শুরু করলে! বিরক্ত কণ্ঠ ফাদারের।তোমার কি ধারণা, আবার সেই বৃদ্ধ পাদ্রী!

চুপ করুন আপনারা! পেছনে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ।ফ্র্যাঙ্ক অলিভার।সঙ্গে এসেছে মুসা।

ওই ছেলেটা আমার মেহমান, কিশোরকে দেখিয়ে বললেন অলিভার।আজ রাতে ও আর ওর দুই বন্ধু আমার ঘরেই থাকছে।এই যে, এ হল মুসা আমান।আমাকে বলেছে, খানিক আগে গির্জার ভেতরে আলো দেখেছিল।কিশোরকে ডেকে দেখিয়েছে আলোটা।ব্যাপার কি দেখতে এসেছে কিশোর পাশা।

বিরক্ত চোখে কিশোরের দিক থেকে চোখ ফেরাল দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার।মুসাকে দেখল, তারপর তাকাল অলিভারের দিকে।বাচ্চাদের এভাবে চোর-পুলিশ খেলা উচিত না।তাদের পক্ষে একজন বয়স্ক লোকের সাফাই গাওয়া আরও অনুচিত।

স্থির হয়ে গেলেন অলিভার।নাক কোচকালেন।

কিন্তু গির্জার ভেতরে আলো দেখেছি আমি! জোর দিয়ে বলল মুসা।

এবং কেউ একজন ছিল, যযাগ করল কিশোর।কালো আলখেল্লা, সাদা কলার।ফাদার স্মিথ, আপনি যেমন পরেন, তেমনি।ধবধবে সাদা লম্বা লম্বা চুল।হাতে ছিল একটা মোমবাতি।

পোলাপানের গপ্পো! বিড়বিড় করল পুলিশ অফিসার।খোকা, বল না যেন, কিছু চুরি গেছে গির্জা থেকে।

গেছেই তো, বলে বসল কিশোর।গতরাতে ছিল ওটা, এখন নেই।সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ফাদারের দিকে।একটা স্ট্যাচু ছিল ওখানটায়, একটা জানালার পাশে দেয়ালের একটা জায়গা নির্দেশ করল সে।সবুজ ফতুয়া গায়ে, মাথায় চোখা লম্বা, চুড়াঅলা টুপি, হাতে লাঠি।

ফাদারকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল দুই পুলিশ অফিসার।

সত্যিই তো! ঠিকই বলেছে ছেলেটা, বলে উঠল তরুণ অফিসার।গতরাতে একটা মূর্তি ছিল ওখানে, সেইন্ট প্যাট্রিকের মূর্তি সম্ভবত! সব সময় যিনি সবুজ ফতুয়া পরে থাকেন, মাথায় বিশপের টুপি-কি যেন নাম টুপিটার, ফাদার?

দেয়ালের দিক থেকে চোখ ফেরালেন ফাদার।মাইটার, বিড়বিড় করে বললেন।সব সময়ই মাইটার মাথায় রাখেন সেইন্ট প্যাট্রিক, হাতে বিশপের।লাঠি।

তো কোথায় গেল মূর্তিটা? জানতে চাইল পুলিশ অফিসার।

এ গির্জায় কখনও সেইন্ট প্যাট্রিকের মূর্তি ছিল না, অস্বস্তি বোধ করছেন। ফাদার, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে।থাকার কথাও না।এটা সেইন্ট জুডসের গির্জা।অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্যাপারে খ্যাতি আছে তার।

হু, তরুণ অফিসারের কণ্ঠে অবিশ্বাস।আপনার হাউসকীপার প্রায়ই বৃদ্ধ ফাদারকে দেখতে পায়, যেটা অসম্ভব।এই ছেলেটা তাকে দেখেছে, এটা অসম্ভব।গতরাতে আমরা কয়েকজন দেখেছি একটা মূর্তি, যা নাকি কখনও ছিলই না এ গির্জায়, এটা আরেক অসম্ভব।এই গির্জার কোথাও এক-আধটা মাইটার আছে?

চমকে উঠলেন যেন ফাদার।গতকাল আনা হয়েছিল।একটা মাইটার আর একটা বিশপের লাঠি।

কেন?

একটা বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন ফাদার। বড়দিন উপলক্ষে। গুরুজনদের সামনে অভিনয় করেছিল বাচ্চা-কাচ্চারা।মধ্যযুগে যেমন হত।ন্যাটিভিটি আর তিন জ্ঞানী লোকের ঘটনা অভিনীত হয়েছিল।অভিনয়ের শেষদিকে এসে ঢোকেন সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি আর সাধুরা, তাঁদের মাঝে সেইন্ট প্যাট্রিকও থাকেন। সেইন্ট প্যাট্রিক সাজানর জন্যেই ফতুয়া, টুপি আর লাঠি ভাড়া করে আনা হয়েছে।আজ আবার ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি ওগুলো যেখান থেকে এনেছিলাম।

হ্যাঁ, হা! চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ফেলল কিশোর।এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল চোরটা!

মানে? ভুরু কোঁচকাল তরুণ পুলিশ অফিসার।

একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, ভারিক্কি ভাবটা চেহারায় ফুটিয়ে তুলল কিশোর! গত সন্ধ্যায় এসেছিল এ-পাড়ায়।পাশের গলির এক বাড়িতে ঢুকেছিল।পুলিশের তাড়া খেয়ে এসে ঢুকল গির্জায়।বুঝতে পারল, এখানে ঢুকেও সহজে রেহাই পাবে না।পুলিশ আসবেই। চোখ পড়ল ফতুয়া, মাইটার আর লাঠির ওপর।উপস্থিত বুদ্ধি আছে চোরটার, কোন সন্দেহ নেই।তাড়াতাড়ি সেইন্ট প্যাট্রিক সেজে দেয়ালের গা ঘেঁষে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল।চোখ এড়িয়ে গেল আপনাদের।

কিশোরের দিকে চেয়ে আছে দুই অফিসার।বিস্ময় ফুটেছে চোখে।

আপনারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে চলে গেলেন, বলে গেল কিশোর।গির্জার দরজায় তালা দিতে এল দারোয়ান, পল মিন।তখনও বেরোয়নি চোর, কিন্তু বেরোতে হবে।দরজা ছাড়া আর কোন পথ নেই।সেদিক দিয়ে বেরোতে গেলেই চোখে পড়ে যাবে দারোয়ানের। অগত্যা তাকে কোন কিছু দিয়ে মেরে বেহুশ করে পালিয়ে গেল।ফাদার, পলের হুশ ফিরেছে? কথা মনে করতে পারছে সে?

মাথা নাড়লেন ফাদার।তেমন কিছুই না।ও বলেছে, পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল কেউ।তারপর আর কিছু মনে নেই।ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দেয়নি ডাক্তার।অবস্থা খারাপই!

হ্যাঁ, শানের ওপর পড়েছিল হয়ত, বলল কিশোর।জোরে বাড়ি খেয়েছে মাথায়।ভাল হয়ে উঠুক।চুরির ব্যাপারে কিছু একটা আলোকপাত করতে পারবে হয়ত–

বেচারা! বিড়বিড় করলেন ফাদার।মস্ত বোকামি করেছি কাল! ওর সঙ্গে আমারও আসা উচিত ছিল!

পুরো ব্যাপারটাই কেমন উদ্ভট! আপনমনেই বলল তরুণ অফিসার।রিপোর্ট কি লিখব! এক চোর, সেইন্টের পোশাক পরে লুকিয়ে থেকেছে! একটা বাচ্চা ছেলে বলছে, সে ভূত দেখেছে...

পাদ্রীর পোশাক পরা একজন মানুষকে দেখেছি, শুধরে দিল কিশোর। ভূত দেখেছি, একবারও বলিনি।

মানুষ কি করে ঢুকল? বলে উঠল তামারা ব্রাইস।তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।দরজায় তালা দেয়া ছিল! ফাদার স্মিথ নিজে দিয়েছেন! ভূতই দেখেছ তুমি, খোকা! বুড়ো ফাদারের ভূত।যাকে আমি দেখেছি।

দরজা যদি বন্ধই থাকবে, এই ছেলেটা ঢুকল কি করে? প্রশ্ন রাখল দ্বিতীয়।অফিসার। আসলে যে ঢুকেছে, সে তালা খুলেই ঢুকেছে।ফাদার, তালার চাবি কার কাছে থাকে?

অবশ্যই আমার কাছে, বললেন ফাদার।মাঝেসাঝে ব্রাইসের কাছেও দিই...আর একটা, দারোয়ান পলের কাছে–ওটা সম্ভবত হাসপাতালে, পকেটের আর সব জিনিসের সঙ্গে রয়েছে।আমারটা কিংবা পলেরটা হারিয়ে যেতে পারে, তাই বাড়তি আরও একটা চাবি আছে।রেকটরির নিচতলায়, কোট রাখার হ্যাঁঙারের পাশে, ছোট একটা হুকে ঝোলানো থাকে।

এখনও কি আছে চাবিটা, ফাদার? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ঝট করে কিশোরের দিকে চোখ ফেরালেন ফাদার।দেখলেন এক মুহূর্ত।তারপর ঘুরে প্রায় ছুটে চলে গেলেন।কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলেন রেকটরি থেকে।মুখচোখ শুকনো। নেই!

কেউ কোন কথা বলল না।

এটা–এটা এক ধরনের বোকামি, আপনমনেই বললেন ফাদার।দুদুটো চাবি থাকতেও বাড়তি আরেকটা চাবি খোলা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা! তাহলে আর দরজায় তালা দেবার মানে কি হল!

সেটা আপনারা জানেন, ফস করে বলে বসল দ্বিতীয় অফিসার।ফাদার, মনে হচ্ছে, যে কেউ যে-কোন সময় ওখান থেকে চাবিটা নিতে পারে?

মাথা ঝোঁকালেন ফাদার।থমথমে চেহারা।

লেফটেন্যান্টকে ডাকা দরকার, সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল অফিসার।নিজের।কানেই শুনে যাক, সেইন্টের ছদ্মবেশে হাওয়া হয়ে গিয়েছে চোর।চাবি চুরি করে গির্জায় এসে ঢুকেছে পাদ্রীর প্রেতাত্মা!

নিচু গলায় বিড়বিড় করে কি পড়ছে তামারা ব্রাইস।ক্রুশ আঁকছে বুকে।

হাউসকীপারের দিকে চেয়ে বললেন ফাদার, আর কোন কাজ নেই এখানে আমাদের, ব্রাইস।চল, রেকটরিতে চল।চমৎকার এক কাপ চা খাওয়াবে আমাকে!

.

০৯.

অলিভারের ঘরে থেকে, বাকি রাতটা পাহারা দিয়েই কাটাল তিন গোয়েন্দা।চোর বা ভূত, কোনটাই আর কোন উপদ্রব করল না।খুব ভোরে উঠলেন মিস্টার অলিভার।ডিম ভাজলেন, টোস্ট তৈরি করলেন।এসে ঢুকলেন বসার ঘরে।

এই যে, ছেলেরা, বললেন অলিভার।নাশতা রেডি।খেতে এস।

নীরবে কয়েক মিনিট খাওয়া চলল।

তারপর? জিজ্ঞেস করলেন অলিভার।কোন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছ?

হ্যাঁ, একটা ডিমের বেশির ভাগই মুখে পুরে দিয়েছে মুসা।চিবোতে চিবোতে বলল, এ-রহস্যের সমাধান করা আমাদের কম্মো নয়!

খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাও তুমি, মুসা, গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর।সবে।তো খেল রু। জমাট বাঁধতে শুরু করেছে রহস্য।প্রচুর চিন্তাভাবনা আর সময় ব্যয় করতে হবে এর পেছনে।

যেমন?

যেমন, চোর।গির্জায় কেন ঢুকেছিল, জানা দরকার।অন্তত অনুমান করতে পারা দরকার।

তাছাড়া, বললেন অলিভার, জানা দরকার, আমার ঘরে আসে যে ছায়াটা, ওটার সঙ্গে চোরের কি সম্পর্ক!

হ্যাঁ, বলল কিশোর।ঠিকই বলেছেন।ছায়া আর চোরের সঙ্গে যোগসাজশ থাকাটাও বিচিত্র নয়।আচ্ছা, মিস্টার অলিভার, ছায়াটা কি নির্দিষ্ট কোন একটা সময়েই দেখা যায়? দিনে বা রাতে? আমি দেখেছি দুবার, দুবারই সন্ধ্যাবেলা।আপনি?

ভাবলেন অলিভার। সাধারণত, শেষ বিকেলে কিংবা সন্ধ্যাবেলায়। দুএকবার দুপুরের পরেও দেখেছি।

মাঝরাতে, বা তারপর?

তখন তো ঘুমিয়েই থাকি।তবে কোন-কোনদিন আগে জেগে উঠি, এই পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ করার জন্যে।তবে ওসময় কখনও দেখিনি।

মাথা ঝোকাল কিশোর।তাহলে, আজ আর সারাদিন আমাদের থাকার কোন দরকার নেই। চলে যাব এখন।বিকেল নাগাদ ফিরে আসব।রকি বীচে যেতে হবে।কাজ আছে।বোঝা যাচ্ছে, ততক্ষণ আপনি নিরাপদ।আশা করছি, ছায়াটা ঢুকবে না ততক্ষণে।

নাশতা শেষ করে উঠে পড়ল ছেলেরা।বেরিয়ে এল ঘর থেকে।সিঁড়ি দিয়ে সবে চত্বরে নেমেছে, পুলের ধারে একটা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টমি গিলবার্ট।

এই যে ছেলেরা, ডাকল টমি।শুনলাম, গির্জায় নাকি ভূত দেখেছ গতরাতে? ওসব ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ।আমাকে যদি ডাকতে তখন!

ডাকব? টমির দিকে চেয়ে আছে কিশোর।কি করে? তখন তো আপনার কাজের সময়, দোকানে থাকার কথা।

গতরাতে ছুটি ছিল আমার।রোজই কাজ করে না লোকে।

ভূত দেখা গেছে, কি করে জানলেন? জিজ্ঞেস করল মুসা।

এ আর এমন কি কঠিন? যে পাড়ায় মিসেস ডেনভার আর ব্রাইস রয়েছে, সে পাড়ার লোকের খবর জানতে অসুবিধে হয় নাকি? ভোর হবার আগেই ছড়িয়ে পড়েছে খবর। বেড়ালটার কাছে শুনলাম।

বেড়াল! বিস্মিত রবিন।

ওই আর কি।বেড়াল-মানব, ব্রায়ান এনড্রু।

গেটের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামল।তাদের পিছু।নিল টমি।

একটু দাঁড়াও, ডাকল টমি।সত্যিই তোমরা তাকে দেখেছ?

কোন একজনকে দেখেছি, জবাব দিল কিশোর।

দাঁড়াল না তিন গোয়েন্দা।পেছনে টমিকে হাঁ করিয়ে রেখে দ্রুত হেঁটে এসে পড়ল উইলশায়ার স্ট্রীটে।বাস স্টেশনের দিকে চলল।

ওটাকে দেখলেই কেমন জানি গা ছমছম করে! বলল মুসা।ওই টমিটা! বাসে উঠে বসেছে ওরা।

কারণ সে ভূত-প্রেত সম্পর্কে আগ্রহী, বলল কিশোর।অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপারে বিশ্বাসী। ওসব নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে, সিটের পেছনে হেলান দিল গোয়েন্দাপ্রধান।ওর কিছু কিছু বিশ্বাস একেবারে অমূলক নয়।বড় বড় সব ধর্মেই বলে, লোভ আর খুব বেশি টাকা পয়সা থাকা ক্ষতিকর।

অর্থই সকল অনর্থের মূল, বলল রবিন।

খাঁটি কথা।তবে, আসলে তুমি কি বলতে চেয়েছ, বুঝেছি, মুসা।ওই টমি গিলবার্টের মাঝে অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে।রহস্যজনক কিছু একটা!

ঠিক সকাল সাড়ে নটায় রকি বীচে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

প্যাসিও প্লেসে যা যা ঘটেছে, সব আবার তলিয়ে দেখা দরকার, বলল কিশোর।চল, আগে হেডকোয়ার্টারে যাই।

দশ মিনিট পর ট্রেলারের ভেতর এসে ঢুকল ওরা।পুরানোপোড়া ডেস্কটা ঘিরে বসল।

একসঙ্গে তিনটে রহস্যের সমাধান করতে হচ্ছে এখন আমাদের, আলোচনা শুরু করল কিশোর।এক নাম্বার, ওই ছায়া।কি ওটা, কার ছায়া, কি করে ঢোকে মিস্টার অলিভারের ঘরে? দুই, চোর-কুকুরের মূর্তিটা যে চুরি করেছে।কে সে? গির্জায় কি কাজ তার? শেষ, এবং তিন নাম্বারটা হল, পাদ্রীর ভূত।আসলেই কি সে ভূত? ছায়া, আর চোরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

ছায়াটা কার, তা-তো জানিই আমরা, বলল মুসা।তুমি আর মিস্টার অলিভার, দুজনেই চিনতে পেরেছ।টমি গিলবার্ট।

দেখেছি সত্যি, মাথা ঝাঁকাল কিশোর, তবে চিনতে পেরেছি বলব না।পলকের জন্যে দেখেছি।তাই নিশ্চিত হতে পারছি না।তোমরা দুজনও যদি দেখতে, একমত হওয়া যেত।

ছায়াটা আর যাই হোক, বলল রবিন, মিসেস ডেনভারের নয়।সে শুধু তালা খুলে দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকত, দেয়াল গলে আসত না।

আবার মাথা ঝোঁকাল কিশোর।এবং আকারেও ছায়াটার সঙ্গে অনেক অমিল।মহিলা বেঁটে, মোটা।ছায়াটা লম্বা, হালকা-পাতলা।টমির সঙ্গে মিলে যায়।কিন্তু বুঝতে পারছি না, কোন

পথে কি করে ঢোকে সে এত নিঃশব্দে! আর, একজন।লোক একই সময়ে দুজায়গায় থাকে কি করে? দুবার তাকে মিস্টার অলিভারের ঘরে দেখেছি, দুবারই ওই সময়ে নিজের ঘরে ছিল সে।ঘুমোচ্ছিল, এবং ঝিমোচ্ছিল।

কাঁধ ঝাঁকাল মুসা।হয়ত অন্য কারও ছায়া!

কিন্তু মান্দালাটার কথা জানে টমি, মনে করিয়ে দিল রবিন।নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে, যেন দেখেছে নিজের চোখে।মিস্টার অলিভার কখনও তাকে ঘরে ডেকে নেননি, এ-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই।

অর্থাৎ, ছায়ার ব্যাপারে আমাদের প্রধান সন্দেহ, টমি গিলবার্ট, ব্যাপারটার ওপর আপাতত ইতি টানল কিশোর।তবে আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই, কোনরকম ব্যাখ্যাও দিতে পারছি না ছায়াটার। আচ্ছা, এবার চোরের কথায় আসা যাক। নিশ্চয় ব্যাটা মিস্টার অলিভারের ভাড়াটে, কিংবা কোন প্রতিবেশী।কারণ, তার জানা আছে, গির্জার একটা চাবি ঝোলানো থাকে কোটের হ্যাঁঙারের পাশে, রেকটরিতে।তার আরও জানা আছে, কুকুরের মূর্তি...আচ্ছা, বার বার এই মূর্তি মূর্তি বলতে ভাল্লাগছে না! একটা কিছু নাম দেয়া যাক এর।কি নাম? বন্ধুদের দিকে তাকাল সে।

ভূতুড়ে কুকুর, বলল মুসা।

নাহ, ভাল্লাগছে না, মাথা নাড়ল রবিন। কাঁপাথিয়ান হাউণ্ড?...নাহ্, এটাও পছন্দ না...তাহলে কি? কিশোর, তুমি একটা বল।

শ্বাপদ-শ্বাপদ-হলে কেমন হয়?

ছায়াশ্বাপদ! চমৎকার! মুসা, তুমি কি বল?

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মুসা।

বেশ, আবার আগের কথার খেই ধরল কিশোর।এবং এর মূল্য কতখানি, জানা আছে চোরের।কে জানতে পারে?

ছায়াটা, অনুমান করতে চাইছে মুসা, মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকে তার ডায়েরীতে হয়ত লেখা দেখেছে।কিংবা ফোনে তিনি কারও সঙ্গে আলাপ করেছিলেন, সে-সময় শুনেছে।

মিসেস ডেনভার হতে পারে? বলল রবিন।ও-তো মিস্টার অলিভারের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে।দেখে ফেলাটা অসম্ভব নয়।

ও জানলে ওই পুরো এলাকা জেনে যেত ওটার কথা, প্রতিবাদ করল মুসা।

জানেনি, কি করে শিওর হচ্ছ? কিশোর, তোমার কি মনে হয়? গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল রবিন।চুরি করার উদ্দেশ্যেই কি জ্যাক ইলিয়টের ঘরে ঢুকেছিল চোর?

বলা শক্ত।কি করে সে জানল, তখন রয়েছে ওখানে? হয়ত মূল্যবান কিছু চুরির উদ্দেশ্যেই ঢুকেছিল, পেয়ে গেছে মূর্তিটা।ওই পাড়ার কেউ হয়ে।থাকলে, নিশ্চয় জানা ছিল, বাড়িটা খালি পড়ে আছে।ঢুকে পড়েছে।ওর কপাল খারাপ, রাস্তার মোড়েই ছিল পুলিশ।মিকোর চেঁচামেচি শুনে তাড়া করে এল তারা। ছুটে গিয়ে গির্জায় ঢুকে পড়ল চোর। সেইন্ট প্যাট্রিকের স্ট্যাচু সেজে দাঁড়িয়ে গেল দেয়াল ঘেষে।সাহস আছে বলতে হবে!

তারপর, পুলিশ চলে গেল, কিশোরের কথার পিঠে বলল রবিন।তালা দিতে এল দারোয়ান পল।তাকে আহত করে পালাল চোর।

আমার মনে হয়, শুধু বেরিয়ে যাবার জন্যে পলকে আহত করেনি চোর, বলল কিশোর। তাহলে এত গুরুতর জখম করত না হয়ত, ওকে হাসপাতালে কিছু দিনের জন্যে সরিয়ে দিতেই কাজটা করেছে সে।গির্জায়ই কোথাও লুকিয়ে।রেখেছিল ছায়াশ্বাপদ।পরের রাতে এসে আবার নিয়ে যাবার ইচ্ছে।পল থাকলে।সেটা করতে অসুবিধে।তাই বেচারাকে প্রচণ্ড মার খেতে হল।মেরেই ফেলতে চেয়েছিল কিনা, কে জানে!

কিন্তু কেন? প্রশ্ন রাখল মুসা। যা শুনেছি, জিনিসটা খুব বেশি বড় নয়। পকেটে নিয়েই স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারত চোর।এত সব ঝামেলায় গেল কেন?

পারত, কিন্তু খুব বেশি ঝুঁকি হয়ে যেত, বলল কিশোর। ওর হয়ত ভয় ছিল, স্কোয়াড কারগুলো আবার ফিরে আসতে পারে, কিংবা সবগুলো তখনও যায়ইনি এলাকা ছেড়ে-আড়ালে থেকে গির্জার ওপর চোখ রেখেছে পুলিশ।কিংবা হয়ত পাড়ার সব বাড়িতে তল্লাশি চালাবে রাতের কোন এক সময়ে। তারচেয়ে গির্জায় লুকিয়ে রেখে যাওয়াটাই নিরাপদ মনে করেছিল সে।

তারপর পাদ্রীর ভূতের ছদ্মবেশে গতরাতে আবার এসে ঢুকেছে গির্জায়?

আমার তাই ধারণা।এমনিতেই এমন একটা গুজব ছড়িয়ে আছে ওই এলাকায়।বৃদ্ধ পাদ্রীর ছদ্মবেশ নিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে।আমি সামনাসামনি দেখেও চিনতে পারিনি। হয়ত কেউই পারত না।বরং তাৎক্ষণিক একটা ধাঁধায় ফেলে দিত যে-কোন দর্শককে, আমাকে যেমন দিয়েছিল।

বেশ, বলল রবিন, বুঝলাম।কিন্তু এই সাধু পুরুষটি কে?

আর কে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিল মুসা, টমি গিলবার্ট।ভূত-প্রেত তার বিষয়।তাছাড়া গতরাতে ডিউটি ছিল না তার।ওই অদ্ভুত ছদ্মবেশ নেবার কথা তার মাথায়ই তো আসবে!

আমি কিন্তু মানতে পারছি না, গম্ভীর হয়ে আছে কিশোর।টাকাপয়সার লোভ তার আছে বলে মনে হয় না।এ-ধরনের অদ্ভুত সাধনা যারা করে, তাদের।প্রথম পাঠই হল, জাগতিক লোভ আর আকর্ষণ ত্যাগ করা।

কিন্তু ওর টাকার দরকার, উত্তেজিত হয়ে পড়েছে রবিন।ভারতে যাবার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার।

ঠিক, ঠিকই বলেছে রবিন! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ভুলে যাচ্ছ কেন, পুলিশ যখন চোরটাকে তাড়া করেছিল, টমি ঘুমিয়ে ছিল।তার ঘরে, মনে করিয়ে দিল কিশোর।পুলিশ যখন গির্জার ভেতরে খোঁজাখুঁজি করছে, টমি আমাদের সঙ্গেই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।চোর তখন মূর্তি সেজে গির্জার ভেতরেই ছিল।

কিন্তু, একই সঙ্গে দুজায়গায় থাকতে পারে শুধু টমি, যুক্তি দেখাল রবিন।তার পক্ষেই গির্জার ভেতরে-বাইরে একই সময়ে থাকা সম্ভব।

জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর।অতি কল্পনা! তবে, টমি কিছু একটা ঘটাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।লোকটার ওপর চোখ রাখা দরকার... থেমে গেল টেলিফোনের শব্দে। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার।হ্যালো..ও, মিস্টার অলিভার?...এক সেকেণ্ড।একটা সুইচ টিপে দিল।হ্যাঁ, এবার বলুন।

টেলিফোন লাইনের সঙ্গে স্পীকারের যোগাযোগ করে নিয়েছে কিশোর।হেডকোয়ার্টারে বসা সবাই একই সঙ্গে কথা শোনার জন্যে।

এইমাত্র টেলিফোন করেছিল একটা লোক, স্পীকারে শোনা গেল অলিভারের কথা, কাঁপা কাঁপা, উত্তেজিত।কুকুরের মূর্তিটা আছে এখন ওর কাছে।তোমাদের সন্দেহ ছিল, এমন একটা জিনিস বিক্রি করতে পারবে না সে সহজে।কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পারছে।ভাল ক্রেতাকেই খুঁজে বের করেছে সে।আমি।দশ হাজার ডলার।দাম চেয়েছে সে আমার কাছে!,

.

১০.

বোমা ফেটেছে যেন ট্রেলারের ভেতর।স্তব্ধ হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা।

কিশোর? আছ তুমি ওখানে? আবার শোনা গেল অলিভারের উত্তেজিত কণ্ঠ।

আঁ-হা! বলুন! কোনমতে বলল কিশোর।

আমি...আমি মনস্থির করতে পারছি না, বললেন অলিভার।একটা চোরের সঙ্গে হাত মেলাব? কিন্তু মূর্তিটাও যে আমার দরকার! ওটা হাতছাড়া করতে পারব না কিছুতেই। টাকাটা দিয়েই দেব কিনা ভাবছি! আমারই জিনিস ওটা।জ্যাককে টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। কাজেই চোরের কাছ থেকে আমি আবার ওটা কিনে নিলে কারও কিছু বলার নেই।দুদিন সময় দিয়েছে সে আমাকে।

পুলিশকে জানিয়েছেন?

ইচ্ছে নেই।চোরটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।তাহলে হয়ত চিরদিনের জন্যেই হারাব মূর্তিটা।

ভেবে দেখুন ভাল করে, বলল কিশোর। ভয়ানক এক অপরাধীর সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছেন।পলকে কি করেছে সে, জানেন।

জানি। ভয় পেয়ে গিয়েছিল চোরটা, জান বাঁচানো ফরজ ভেবেছে। পলকে বেহুশ করে পালিয়ে গেছে।আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তার, তেমন কিছু করব না।তো, তোমরা কখন আসছ? একা একা ভাল লাগছে না আমার, কেমন যেন।অস্বস্তি বোধ করছি।

ছায়াটা এসেছিল আর?

না।তবে, এসে পড়তে পারে...সত্যি বড় ভয় পাচ্ছি আমি!

তিনটার বাস ধরব আমরা, দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল কিশোর।ওদের মত জানতে চাইছে। মাথা ঝোকাল ওরা।আঁধার নামার আগেই পৌঁছে যাব।

গুড বাই জানিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর।মেরেছে।এবার চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তাঁকে! বাড়তি কিছু কাপড়-চোপড় সঙ্গে নেব, ভাবছি। মিস্টার অলিভারের ওখানে দিনকয়েক থাকার দরকার হতে পারে।তিনটার আগেই বাস স্টেশনে চলে এস। ঠিক আছে?

মাথা ঝোকাল মুসা।টমির ওপর চোখ রাখবে বললে...

পরে আলোচনা করব ওসব নিয়ে।এখন কিছু জরুরি কাজ সারতে হবে।

বেরিয়ে চলে গেল রবিন আর মুসা।রবিনের কিছু কাজ আছে লাইব্রেরিতে, সেখানে যাবে। মুসা সোজা চলে গেল বাড়িতে।তার খিদে পেয়েছে।

কিশোরও বেরোল। লোহার একটা আলমারির মরচে পরিষ্কার করায় মন দিল। সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে।আসলে কোন একটা কাজে মগ্ন থেকে ভাবতে চাইছে সে ঠাণ্ডা মাথায়। দুপুরের খাবার খেতে ডাকলেন মেরিচাচী।খেয়ে এসে সোজা নিজের ওয়ার্কশপে ঢুকল কিশোর।ইলেকট্রনিক কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করে দিল।শেষে যন্ত্রপাতিগুলো বাক্সে গুছিয়ে ভরে নিল।সময় হয়ে গেছে।বাক্সটা নিয়ে বাস স্টেশনের দিকে রওনা হল সে।

আরে! ওই বাক্সের ভেতর কি? কৌতূহল ঝরল রবিনের গলায়।নতুন কোন আবিষ্কার?

একটা ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা আর রিসিভার, জানাল। কিশোর। একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ব্যবহার হয়েছে।

হ্যাঁ, বলল মুসাঁ। আজকাল বেশির ভাগ বড় দোকানেই এ-জিনিস ব্যবহার হচ্ছে। চোর ধরার জন্যে।

তোমারটা কোথায় পেলে? জানতে চাইল রবিন।

স্টোরে আগুন লেগেছিল, বলল কিশোর। অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছে। এটাও নষ্ট হয়েছিল।অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে চাচা কিনে নিয়ে এসেছেন।খুলে দেখলাম, খুব বেশি কিছু খারাপ হয়নি।সহজেই ঠিক করে নিলাম।

এর সাহায্যেই টমির ওপর চোখ রাখব?

হ্যাঁ।চত্বরের দিকে কোন জানালা নেই মিস্টার অলিভারের ঘরে।ব্যালকনিতে বসে চোখ রাখা যাবে না।আমরা যাকে দেখব, সে-ও আমাদের দেখে ফেলবে।কাজেই, এই যন্ত্রটা ছাড়া উপায় নেই।সিঁড়ির নিচে বড় একটা ফুল গাছের ঝাড় আছে।ওটার ভেতর লুকিয়ে রাখব ক্যামেরাটা।ঘরে বসে আরামসে চোখ রাখতে পারব।

খাইছে! কিশোর, তোমার তুলনা হয় না! জোরে হাততালি দিল মুসা।ব্যক্তিগত চ্যানেলে টিভি দেখব আজ!

এক ঘণ্টা পর।মিস্টার অলিভারের বাড়িতে এসে পৌঁছল তিন গোয়েন্দা।ঢোকার মুখেই গেটে দেখা হয়ে গেল সদা-উপস্থিত মিসেস ডেনভারের সঙ্গে।

আবার এসেছ? বাক্সটার দিকে চেয়ে আছে মহিলা।এটার ভেতর কি?

একটা টেলিভিশন সেট, সহজ গলায় বলল কিশোর।মিস্টার অলিভারের জন্যে বড়দিনের উপহার।

মহিলার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান।পুলের ধারে চেয়ারে বসে ধূমপান করছে জ্যাকবস।উপভোগ করছে পড়ন্ত বেলার রোদ।পাশে গামলার মত সেই অ্যাশট্রেটা। প্রতি দুই কি তিন সেকেণ্ড পর পরই ছাই ঝাড়ছে তাতে।কিশোর তাকাতেই হাসল।মিস্টার অলিভারের ওখানে থাকবে আজ রাতে?

ইচ্ছে আছে, জবাব দিল কিশোর।

ভাল, অ্যাশট্রেতে ঠেসে সিগারেট নেবাল জ্যাকবস।পরীক্ষা করে দেখল, সত্যিই নিবেছে কিনা আগুন।চোখ তুলল।মানুষটা বড় বেশি একা।মাঝেমধ্যে সঙ্গ পেলে ভালই লাগবে। আমি তো একা থাকতেই পারি না।আমার ভাগ্নেটা গেছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। দুদিনেই একা একা লাগতে শুরু করেছে আমার।উঠে দাঁড়াল সে।চলে গেল তার ফ্ল্যাটের দিকে।

দোরগোড়াতেই ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা করছেন অলিভার।টেলিভিশন ক্যামেরাটা দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি।কখন সেট করবে?

সাঁঝের দিকে, বলল কিশোর, অন্ধকার হয়ে এলে।এই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

হ্যাঁ, সেটাই উপযুক্ত সময়, বললেন অলিভার।তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে।তোমাকে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চত্বরে আলো জ্বলে ওঠে আপনাআপনি।

৫-২০-এ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল কিশোর।আশপাশটা দেখল।পেছনে।চেয়ে নিচু গলায় বলল, বের করে নিয়ে এস।কেউ নেই।

দ্রুত সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।একটা ধাতব তেপায়ার ওপর ক্যামেরাটা বসাল কিশোর, কায়দা করে লুকিয়ে রাখল ফুলঝাড়ের ভেতর।দ্রুতহাতে লেন্স অ্যাডজাস্ট করল, প্রায় পুরো চত্বরটাই এসে গেল ক্যামেরার চোখের নাগালে।

ট্রানজিসটরাইজড করা আছে ক্যামেরাটা, আবার ঘরে ঢুকে দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। ব্যাটারিতে চলে।দূরত্ব খুব বেশি না, তবে আমাদের কাজের জন্যে যথেষ্ট।

সদর দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। একটা বুককেসের ওপর রাখল টেলিভিশনটা। বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে কানেকশন করে দিয়ে ডায়াল ঘোরাল+ সেকেণ্ডখানেক পরেই আবছা আলো দেখা গেল পর্দায়, কাঁপছে।

কই? বলে উঠল মুসা, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না!

যাবে, বলল গোয়েন্দাপ্রধান।চত্বরে আলো জ্বলে উঠলেই দেখতে পাবে।

মিনিট কয়েক পরেই দপ করে জ্বলে উঠল আলো। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে ওরা টেলিভিশনের পর্দার দিকে।পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পুরো চত্বরটা।নির্জন।

প্রথমে টমি গিলবার্টকে দেখা গেল।ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পাশের সরু গলি ধরে চলে গেল। ফিরে এল খানিক পরেই।হাতে একটা লন্ড্রি ব্যাগ।আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

তারপর দেখা গেল একটা মেয়েকে, সোনালি চুল।সামনের গেট দিয়ে চত্বরে ঢুকল।

লারিসা ল্যাটনিনা, বললেন অলিভার।

গটগট করে নিজের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লারিসা।চাবি বের করে তালায় ঢোকাল। ঠিক এই সময় তার পেছনে এসে উদয় হল মিসেস ডেনভার।হাতে ছোট একটা প্যাকেট।

নিশ্চয় ডাকে এসেছে, কিংবা কেউ দিয়ে গেছে প্যাকেটটা, বললেন অলিভার।লারিসার জন্যে।ভাড়াটেরা যখন বাড়ি থাকে না, তাদের কোন জিনিস এলে সই করে রেখে দেয় ম্যানেজার।এটা তার দায়িত্ব।

নিশ্চয় কাজটা তার খুব পছন্দ, বলল মুসা।

ঠিক ধরেছ, বললেন অলিভার।চুরি করে খুলে দেখে নিশ্চয়।ভাড়াটেদের সম্পর্কে জ্ঞান আরও বাড়ে তার।বদস্বভাব!

প্যাকেটটা লারিসার হাতে তুলে দিয়েছে ম্যানেজার।দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।নিশ্চয় জানতে চাইছে ভেতরে কি আছে।

হতাশ একটা ভঙ্গি ফুটল লারিসার হাবভাবে।হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে, প্যাকেটের মোড়ক খুলতে শুরু করল।

এই সময় নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকবস।থেমে দাঁড়াল।লারিসা আর মিসেস ডেনভার কি করছে, দেখছে।

লোকের গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই এ-বাড়িতে! বলেই ফেলল মুসা।

বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন অলিভার।ওই বুড়িটার কথা কেন শুনছে লারিসা! দেখাব না, বলে মানা করে দিলেই হত! খুব বেশি সরল।

মোড়ক খুলে ফেলেছে লারিসা।একটা টিনের বাক্স।ডালা খুলল।হাসি ফুটল তার মুখে। দুই আঙুলে কিছু একটা বের করে এনেই মুখে ফেলল।মিসেস ডেনভারকেও সাধল।মাথা নাড়ল ম্যানেজার।

চকলেট, বলল কিশোর।

খামোকা সাঁতার কাটে! বললেন অলিভার।অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া বাদ।দিলেই হয়ে যেত। মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকত না আর।

বাক্স থেকে আরেকটা চকলেট বের করে মুখে ফেলল লারিসা।ডালা বন্ধ করল।হঠাৎ ঝটকা দিয়ে গলার কাছে উঠে এল তার হাত।বাক্সটা খসে পড়ে গেল।ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চকলেটগুলো।

আরে...! কথা আটকে গেল মুসার।

টলে উঠল লারিসা।সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল।পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে।হাত-পা ছুঁড়ছে, মোচড়াচ্ছে শরীরটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিন কিশোর।হ্যাঁচকা টানে সদর দরজা খুলে ফেলল কিশোর, বেরিয়ে এল।এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নেমে চলল নিচে।

মিস ল্যাটনিনা! কানে আসছে ম্যানেজারের শঙ্কিত কণ্ঠ।কি হয়েছে?

ব্যথা! গুঙিয়ে উঠল লারিসা।জ্বলে যাচ্ছে...ওহহ!...মাগো...

ছুটে এসে দাঁড়াল কিশোর।নিচু হয়ে একটা চকলেট তুলে নিল।পাশে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন।অলিভার এলেন।হাঁপাচ্ছেন তিনি।

তীক্ষ্ণ চোখে চকলেটটা দেখল কিশোর।নাকের কাছে তুলে এনে শুকল।ফিরে চাইল।

লারিসার ওপর ঝুঁকে বসেছে জ্যাকবস।টমি গিলবার্টও বেরিয়ে এসেছে।বেরোচ্ছে ব্রায়ান এনড্রু।

কিশোরের হাত খামচে ধরল মিসেস ডেনভার।কি...কি আছে ওটাতে?

তালুতে রেখেই চাপ দিয়ে চকলেটটা দলে-মুচড়ে ফেলল কিশোর। আবার। নিয়ে এল নাকের কাছে। শুকল। চেঁচিয়ে উঠল, জলদি! জলদি অ্যামবুলেন্স ডাকুন! মনে হয় বিষ খাওয়ানো হয়েছে মিস ল্যাটনিনাকে!

১১.

অ্যামবুলেন্স ডাকার সময় নেই! চেঁচিয়ে বলল জ্যাকবস। আমার গাড়িতে করেই নিয়ে যাচ্ছি ইমার্জেন্সীতে!

আমি যাব আপনার সঙ্গে! বলে উঠল মিসেস ডেনভার।

বাক্সতে তুলে চকলেটগুলোও নিয়ে যান, বলল কিশোর। পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

গ্যারেজ থেকে দ্রুত গাড়ি বের করল জ্যাকবস। পাজাকোলা করে লারিসাকে তুলে নিল মুসা। গাড়িতে তুলে দিল। একটা কম্বল এনে মেয়েটার গায়ে জড়াল। মিসেস ডেনভার। চকলেটসহ বাক্সটা তার হাতে গুঁজে দিল কিশোর। ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

বিষ! এতক্ষণে কথা বললেন অলিভার। বেচারি! বিষ খাওয়াল কে?

বিষই কিনা জানি না, মিস্টার অলিভার! পুলের দিকে চেয়ে আছে কিশোর। অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলাম চকলেটটাতে!

দুই ঘণ্টা পরে ফিরে এল জ্যাকবস আর মিসেস ডেনভার। সেন্ট্রাল হসপিটালে রেখে এসেছে লারিসাকে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ চেহারা দুজনেরই।

নিজেকে এত অপরাধী মনে হয়নি আর কখনও! বলল ম্যানেজার।

কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন অলিভার। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে সবে রাতের খাওয়া শেষ করেছেন, এই সময় জ্যাকবসের গাড়ির শব্দ কানে এল। চারজনেই ছুটে নেমে এসেছে চত্বরে।

পুলিশ! মুখ বাঁকাল মিসেস ডেনভার। বিচ্ছিরি সব প্রশ্ন করতে শুরু করল! কতক্ষণ বাক্সটা আমার কাছে রেখেছি, কোথায় রেখেছি, কেন রেখেছি, এমনি সব প্রশ্ন। আমি কি করেছি না করেছি তাতে তোমাদের কি, বাপু!

আসলে কি ঘটেছে, বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ, জ্যাকবসের কণ্ঠে ক্লান্তি।

বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে? ওদের কি ধারণা, আমি বিষ খাইয়েছি মেয়েটাকে? ওদের জানা উচিত, জীবনে মানুষ তো দূরের কথা, কোন ইঁদুরকেও বিষ খাওয়াইনি আমি! শেষদিকে ধরে এল ম্যানেজারের গলা। গটমট করে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে ফেলল নিজের ফ্ল্যাটের। ভেতরে ঢুকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল। আবার। তালা লাগানর শব্দ হল।

কি হয়েছিল, জ্যাকবস? বেরিয়ে এসেছে এনড্রু।

বিষাক্ত কিছু ছিল চকলেটে, জানাল জ্যাকবস, ডাক্তারদের ধারণা। হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেছে অ্যানালাইসিসের জন্যে।মিস ল্যাটনিনার স্টমাক ওয়াশ করে একটা প্রাইভেট রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সারারাত পর্যবেক্ষণে রাখবে ডাক্তারুরা। পুলিশকে খবর দেয়া হল।ওরা এসেই ঘেঁকে ধরল মিসেস ডেনভারকে।প্রশ্নের পর প্রশ্ন, নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে বেচারিকে। ভালই হয়েছে। শিক্ষা হবে এতে কিছুটা। আক্কেল থাকলে জীবনে আর অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না। ব্যাপারটা যেভাবে ঘটেছে, যে কারোরই প্রথম সন্দেহ পড়বে তার ওপর।

চকলেট এসেছে কিভাবে, জানেন? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ডাকে।অস্বাভাবিক কিছু নয়।

খুলে গেল মিসেস ডেনভারের দরজা।এরই মাঝে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বেরিয়েই পুলের দিকে তাকাল।প্রতিটি খারাপ ঘটনার একটা ভাল দিকও থাকে।যা আবহাওয়া আর ঠাণ্ডা, ইদানীং শুধু লারিসাই নামত পুলে।দিন কয়েক আর নামতে পারবে না।এই সুযোগে পানি সরিয়ে পুলটা পরিষ্কার করে ফেলতে পারব।অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি।

কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল জ্যাকবস।কাঁধ ঝাঁকাল।সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।এনড্রুও চলে গেল।

ম্যানেজারের দিকে তাকালেন অলিভার।চোখে ঘৃণা- তিনিও এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ব্যালকনিতে উঠে দাঁড়ালেন।ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, মায়ামমতা বলতে কিছু নেই বুড়িটার! ওদিকে মারা যাচ্ছে মেয়েটা! আর বুড়ি বলছে, ভালই হয়েছে! পুল পরিষ্কারের সময় পাওয়া গেল! ওটাকে এবার তাড়াব আমি!

কে বিষ খাওয়াল মেয়েটাকে? ঘরে ঢুকেই আরেকবার প্রশ্নটা করলেন অলিভার।

এমন কেউ, যে মিস ল্যাটনিনার স্বভাব-চরিত্র জানে, বলল কিশোর, যে জানে, সে কখন কি করে না করে।জানে, চকলেট তার প্রিয় জিনিস, পেলেই খাবে।কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন বিষ খাওয়ানো হল তাকে?।

কেউ কোন জবাব দিল না।

আড়াআড়ি পা মুড়ে মেঝেতেই বসে পড়ল কিশোর। টেলিভিশনের ওপর চোখ রাখতে সুবিধে।

বেশ মজার জায়গায় বাস করেন আপনি, মিস্টার অলিভার, টিভির পর্দার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।শূন্য চত্বর।মাত্র তিন দিন আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়।এখানে এসেছি, সে-ও তিন দিন। এরই মাঝে কয়টা ঘটনা ঘটল! দুবার অদ্ভুত এক ছায়াকে দেখলাম, চুরি করে ঘরে ঢুকে ধরা পড়ল মিসেস ডেনভার, দামি।একটা জিনিস চুরি হল, তারপর সেই জিনিসের জন্যে টাকাও দাবি করল চোর।এখন, আপনার এক ভাড়াটেকে বিছু খাওয়াল কেউ।

গির্জার দারোয়ানের কথা বাদ দিলে কেন? মনে করিয়ে দিল রবিন।তাকে মেরে বেহুশ করে ফেলে রেখে গেল।তুমি গিয়ে ভূত দেখলে গির্জায়, আটকা পড়লে।

একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঠিক মেলে না! আপনমনেই বলল গোয়েন্দাপ্রধান।কিন্তু, আমার ধারণা, প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে।একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে। ঘটনার কেন্দ্রস্থল এই বাড়িটা। যা-ই ঘটছে, এর ভেতরে, কিংবা আশপাশে, কাছাকাছি।

হ্যাঁ, সায় দিল মুসা।আর ঘটছে, টমি গিলবার্ট যখন বাড়ি থাকছে তখন। ও কাজে চলে গেলে আর কিছু ঘটে না।

ঝট করে মাথা তুললেন অলিভার।দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন পুরো ঘরে।চাপা গলায় বললেন, আস্তে! কে জানে, এ মুহূর্তে হয়ত এ-ঘরেই রয়েছে সে। ছায়া হয়ে। আমাদের কথা শুনছে!

উঠে পড়ল রবিন।সব কটা আলো জ্বেলে প্রতিটি কামরা ভাল করে দেখে এল।না, কোথাও ছায়াটা চোখে পড়ল না।কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না অলিভার।শঙ্কা গেল না চেহারা থেকে।উঠে গিয়ে এঁটো বাসন-পেয়ালা ধোয়ায় মন দিলেন।টেলিভিশনের সামনে বসে রইল তিন গোয়েন্দা।

পরের কয়েকটা ঘণ্টা কিছুই ঘটল না।চত্বরে কেউই বেরোল না, মিসেস ডেনভার ছাড়া। ময়লা ফেলার জন্য বেরিয়েছিল।ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েই আবার গিয়ে ঘরে ঢুকেছে।বিরক্ত হয়ে উঠছে ছেলেরা, চোখে ঘুম।

দেখ! হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কিশোরের।

পর্দায় দেখা গেল, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে টমি।পুলের কিনারে এসে দাঁড়াল।চেয়ে আছে পানির দিকে।ঘুম চলে গেল মুসা আর রবিনের চোখ থেকেও।

জ্যাকবসের ঘরের দরজা খুলে গেল এই সময়।বেরিয়ে এল সে।ঠোঁটে সিগারেট, হাতে অ্যাশট্রে।কাছে এসে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল টমির দিকে চেয়ে।একটা টেবিলে অ্যাশট্রে রেখে তাতে সিগারেট চেপে নেবাল।গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।কয়েক মুহূর্ত পরেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।মুসা গিয়ে দাঁড়াল একটা জানালার কাছে, রাস্তার দিকে তাকাল।

কোথাও যাচ্ছে সে, জানালার কাছ থেকেই বলল মুসা।খুব জোরে চালাচ্ছে।

হয়ত হাওয়া খেতে যাচ্ছে, বললেন অলিভার।ঘুম আসছে না হয়ত।অস্বস্তি বোধ করছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে অনেকেরই এমন হয়।

ঘরে ফিরে গেল টমি।পর্দা টেনে দিল জানালার।

খাইছে! আবার টেলিভিশনের সামনে এসে বসেছে মুসা।ব্যাটা কি করছে, দেখতে পাব না আর!

কাপড় পরছে হয়ত, বলল কিশোর।কাজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।মাঝরাত থেকে তার ডিউটি।

ঠিক এই সময় নিবে গেল চত্বরের আলো।সেই সঙ্গে নিবে গেল টেলিভিশনের পর্দার আলো। হালকা ধূসর-নীল একটা উজ্জ্বলতা রয়েছে শুধু, টমির জানালার আলো কোনাকুনিভাবে পড়েছে ক্যামেরার চোখে।

আরও ভাল হয়েছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।এবার আর কিছুই দেখতে পাব না।

অটোমেটিক টাইমার লাগানো আছে চত্বরের লাইটিং সিসটেমের সঙ্গে, বললেন অলিভার। ঠিক এগারোটায় অফ হয়ে যায় বাতি।

আমাদেরও টেলিভিশন অফ করে দিতে হচ্ছে, উঠে গিয়ে সুইচ টিপে সেটটা বন্ধ করে দিল কিশোর।

হ্যাঁ, আর দরকার কি ওটার? বলল মুসা।তবে, টমি ব্যাটা কোথায় যাচ্ছে, দেখা দরকার। তোমরা বস।আমি ব্যালকনিতে যাচ্ছি।অন্ধকারে ও আমাকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।তেমন বুঝলে নেমে গিয়ে ফুলঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখব।

খবরদার, বেল-টেল বাজাবে না! হুশিয়ার করে দিল কিশোর।আস্তে করে টোকা দেবে দরজায়।আমরা বেরোব।

ঠিক আছে, উঠে গিয়ে স্কি-জ্যাকেটটা তুলে নিল মুসা।গায়ে চড়াল।সুইচ টিপে বসার ঘরের আলো নিবিয়ে দিল রবিন।মুহূর্তে দরজা খুলে ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল মুসা। পেছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।তবে এবার তালা লাগানো হল না ভেতর থেকে।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।জানে, দরজার ওপাশে তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কিশোর আর রবিন।সে ইঙ্গিত দেয়ামাত্র ছুটে বেরোবে ওরা।

আরও খানিকক্ষণ জ্বলল টমির ঘরের আলো, তারপর নিবে গেল।অপেক্ষা করে রইল মুসা।যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে টমি।সময় যাচ্ছে।কিন্তু বেরোল না সে।রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোর একটা রশ্মি এসে পড়েছে পুলের পানিতে, অন্ধকার গাঢ় হতে পারছে না ওই জায়গাটুকুতে।ওই আলোর জন্যেই আবছাভাবে চোখে পড়ছে টমির ঘরের বারান্দা।মুসার চোখ এড়িয়ে দরজা দিয়ে।বেরোতে পারবে না সে।

সময় যাচ্ছে।মাঝরাত পেরোল।শোনা গেল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ।খানিক পরেই গেটে দেখা গেল একটা লোককে।সতর্ক হয়ে উঠল মুসা।পরক্ষণেই ঢিলা পড়ে গেল আবার সতর্কতায়।পুলের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা।ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস।অ্যাশট্রেটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।পরক্ষণেই আলো জ্বলল তার পর্দা ঢাকা জানালায়।

চোখ মিটমিট করল মুসা।মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড জ্যাকবসের ওপর চোখ ছিল, দৃষ্টি সরে গিয়েছিল বারান্দার ওপর থেকে।ঠিক ওই সময়ে বেরিয়ে এসেছে টমি।জ্যাকবসের ঘরের আবছা আলো পড়ছে তার ওপর। ঘুমোনর পোশাক পরনে। পুলের ধার ধরে নিঃশব্দে এগোচ্ছে জ্যাকবসের ঘরের দিকে।হঠাৎ...

আবার চোখ মিটমিট করল মুসা।দুহাতে রগড়াল।স্বপ্ন দেখছে না তো! টমি নেই! হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে!

দ্রুত দরজায় টোকা দিল মুসা। পরক্ষণেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। দ্রুত চত্বর পেরিয়ে গিয়ে টমির দরজা আগলে দাঁড়াবে।কোন্ পথে ঘরে ঢোকে টমি, দেখবে।

ছুটছে মুসা। পুলের ধারে পৌঁছতেই পায়ের তলায় পড়ল কি যেন! নরম, জ্যান্ত! তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল!

আঁতকে উঠে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল মুসা।সে পা তুলতে না তুলতেই ওটাও লাফ দিয়েছে। পড়ল গিয়ে তার আরেক পায়ের তলায়। আরও জোরে আর্তনাদ করে উঠল। চেঁচিয়ে উঠে আবার সামনে লাফ দিল মুসা।মাটিতে পা ঠেকল না।টের পাচ্ছে, প্যান্টের ঝুল আঁকড়ে ধরে ঝুলছে কিছু একটা।আঁচড় লাগছে পায়ের চামড়ায়।ঝপাং করে পড়ল গিয়ে সে পানিতে।

ঝট করে খুলে গেল এনড্রুর ঘরের দরজা।

দপ করে আবার জ্বলে উঠল চত্বরের আলো।

পুলের ধার খামচে ধরে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে মুসা।শব্দ তুলে মুখ থেকে ফেলছে ক্লোরিন মেশানো পানি।

তার কাছাকাছিই পুলের ধার ধরে সাঁতরাচ্ছে আরেকটা জীব।নিচু হয়ে ঘাড়ের চামড়া ধরে ওটাকে তুলে নিল এনড্রু।কালো একটা বেড়াল।

তুমি...তুমি একটা অমানুষ! মুসার দিকে চেয়ে ধমকে উঠল বেড়াল-মানব।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে ডাঙায় উঠে এল মুসা।ভেজা শরীরে সূঁচ ফোঁটাচ্ছে যেন কনকনে ঠাণ্ডা।

মিস্টার অলিভার! নাকা তীক্ষ্ণ গলা।চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে মিসেস ডেনভার।গায়ে কম্বল জড়ানো।এলোমেলো চুল।মিস্টার অলিভার, ছেলেগুলোকে আটকে তালা দিয়ে রাখলেন না কেন? লোকের ঘুম নষ্ট করছে! এমনভাবে বলল মহিলা, যেন সে-ই এই বাড়ির মালিক।

অলিভারের সাড়া নেই।সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে কিশোর।

হঠাৎ আবার উদয় হয়েছে টমি তার ঘরের দরজায়।

আমার–আমার ঘুম আসছিল না, বিড়বিড় করে বলল মুসা।

জ্যাকবসের দরজাও খুলে গেছে। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে, আবার কি হল?

আমার বেড়ালটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল ছোঁড়াটা! রাগ এখনও পড়েনি। বেড়াল-মানবের।ভেজা, চুপচুপে জানোয়ারটাকে কোলে তুলে নিয়েছে, হাত বোলাচ্ছে গায়ে।আর ভয় নেই, খোকা, মোলায়েম গলায় বলল এনড্রু। চল, গা মুছিয়ে দিচ্ছি। চুলার ধারে বসলেই গা গরম হয়ে যাবে আবার।বাজে ছেলেদের।ব্যবহারই ওরকম, মন খারাপ কোরো না।

আর যেন তোমাকে এসব করতে না দেখি! মুসাকে হুশিয়ার করল মিসেস ডেনভার।

না, ম্যাডাম, করব না, তাড়াতাড়ি বলল গোয়েন্দা সহকারী।

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মিসেস ডেনভার।গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল তার ঘরে।

আজও ছুটি।টমির দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

মাথা ঝোঁকাল টমি।

কেমন কাটছে ছুটি? ভাল?

না-হা–ঠিক তা না!–কি যেন...

কি?

না, কিছু না, চোখ রগড়াচ্ছে টমি।মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলাম!...চলি...

দ্রুত ফিরে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল টমি।

অলিভারের ঘরে এসে ঢুকল মুসা, পেছনে কিশোর।বড় একটা তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছেন অলিভার।বাথরুমে গরম পানির শাওয়ার ছেড়ে দিয়েছে রবিন।

টমি কোত্থেকে উদয় হল? কিশোরের দিকে চেয়ে জ্যাকেট খুলছে মুসা।পুলের ধার ধরে জ্যাকবসের ঘরের দিকে যেতে দেখলাম।হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে! ওকে খুঁজতে গিয়েই এই বিপত্তি!

ওর ঘর থেকেই তো বেরোতে দেখলাম, বলল কিশোর।তুমি তখন পানিতে।

অসম্ভব! জ্যাকেটের চেনে আঙুল থেমে গেছে মুসার।আমি যখন পুলে পড়েছি, টমি তার ঘরে ছিল না। নিজের চোখে দেখেছি, জ্যাকবসের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়েই হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল সে।কোন দিকে গেল, দেখিনি।তবে নিজের ঘরে যায়নি, আমি শিওর!

.

১২.

বাকি রাতটা ব্যালকনিতে বসে পালা করে পাহারা দিয়ে কাটাল রবিন আর কিশোর। অন্ধকার চত্বর।আলো নিবিয়ে দিয়েছে আবার মিসেস ডেনভার।চত্বরের বাতির মেইন সুইচ তার ঘরে।নির্দিষ্ট সময়ে অটোমেটিক কাজ করে লাইটিং সিসটেম, তবে।দরকার পড়লে যে-কোন সময় ওই সুইচ টিপে আলো জ্বালানো-নেবানো যায়।

ভোর চারটা অবধি নির্জন, শূন্য রইল চত্বর।তারপরই বেরিয়ে এল মিসেস ডেনভার।পরনে টুইডের ভারি কোট।তাকে দেখেই ভেতরে ঢুকে গেল কিশোর।

সারাটা রাত বসার ঘরে সোফায় বসে থেকেছেন মিস্টার অলিভার। ঘুমোতে যাননি। ওখানেই বসে বসে ঢুলেছেন।

মিসেস ডেনভার বাইরে যাচ্ছে, বলল কিশোর।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, শান্ত রয়েছেন অলিভার।

এই ভোর রাতে!

হাই তুললেন অলিভার।চব্বিশ ঘণ্টাই বাজার খোলা থাকে, জানই।হপ্তায় একবার বাজার করে ডেনভার, বিষাদ বারে।ভোর চারটের সময় বেরোয়।

অলিভারের দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

তার বক্তব্য, এই সময় বাজারে ভিড় থাকে না, বললেন অলিভার। কেনাকাটা করতে সুবিধে।আমার ধারণা অন্য।এ-সময়ে ভাড়াটেরা সব ঘুমিয়ে থাকে।বুড়িটারও দেখার কিছু নেই।জ্যাকবস অফিসে যায় ভোর পাঁচটায়।এক ঘণ্টা সময় হাতে থাকছে ডেনভারের। বাজার সেরে ফিরে আসতে পারে সে।নিশ্চিন্তে।

কথাবার্তায় তন্দ্রা থেকে জেগে উঠেছে রবিন আর মুসা।

তার মানে, বলল মুসা, আপনি বলতে চাইছেন, লোকে কে কি করছে না করছে, দেখার জন্যে বাড়ি থেকেই বেরোয় না মিসেস ডেনভার? ভাড়াটেরা সব না, ঘুমোলে বাজারেও যায় না?

তাই, মাথা ঝোঁকালেন অলিভার।আশ্চর্য এক চরিত্র! জাল ছেড়ে যেমন মাকড়সা কোথাও যায় না, ওই বুড়িটাও তেমনি।এই বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চায় না।খালি লোকের ওপর চোখ। যেন এসব দেখার জন্যেই বেঁচে আছে সে!

উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালার সামনে দাঁড়াল রবিন।টেনে পর্দা সরিয়ে দিল।গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে।ধূসর সিডান গাড়িটাকে দেখতে পেল সে।

আশ্চর্য! হপ্তায় মাত্র একবার গাড়িটা চালায়! জানালার কাছ থেকেই বলল রবিন।ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায় না?

প্রায়ই দেখি গ্যারেজে খবর দেয়, বললেন অলিভার।মেকানিকস আসে।

এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।সামনেই মোড়।ঠিক এই সময় বুমম করে শব্দ হল।শোনা গেল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন অলিভার।

কিশোর আগেই উঠে পড়েছে।ছুটে যাচ্ছে জানালার দিকে।

পাগলের মত ডানে-বাঁয়ে কাটছে সিডানের নাক।হুডের নিচ থেকে ধোয়া বেরোচ্ছে।

আবার চেঁচিয়ে উঠল মিসেস ডেনভার।পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে গাড়ি, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সামনের একপাশ দিয়ে গুতো মারল রাস্তার পাশের দেয়ালে। ঘষে এগোল। বাম্পারের ধাক্কা লাগাল মোটা একটা পানির পাইপে।ভোঁতা শব্দ তুলে মাটির কয়েক ইঞ্চি ওপর থেকে ছিঁড়ে গেল পাইপ।ওটার ওপরে এসে গাড়ি থামল।চারপাশ থেকে ফোয়ারার মত ছিটকে বেরোচ্ছে পানি।আবার শোনা গেল মিসেস ডেনভারের চিত্তার।

দমকল ডাকতে হবে! ফোন করতে ছুটল মুসা।

দরজার দিকে ছুট লাগিয়েছে রবিন।আগে বের করে আনা দরকার মহিলাকে!

কিশোরও ছুটল রবিনের পেছনে।

হুড়মুড় করে চত্বরে নেমে এল দুজনে।বেরিয়ে এসেছে জ্যাকবস, গায়ে ঘুমানর পোশাক। টমি গিলবার্টও বেরিয়েছে।পাজামা পরনে, গায়ে তাড়াহুড়ো করে একটা কোট চাপিয়েছে। গেটের দিকে ছুটেছে।

সবার আগে ছুটছে জ্যাকবস।মিসেস ডেনভার! চেঁচিয়ে উঠল সে সিডান টাকে দেখেই।

টমির পাশ কাটিয়ে এল ছেলেরা, জ্যাকবসকে পেছনে ফেলে এল।ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়িটার পাশে।বরফ-শীতল পানি ভিজিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর, গ্রাহ্যই করছে না।

স্টিয়ারিঙের পেছনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে চেঁচাচ্ছে মিসেস ডেনভার।তার এ চিৎকার যেন বন্ধ হবে না আর কোনদিন।

মিসেস ডেনভার! হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান লাগাল কিশোর।খুলল না দরজা।বোধহয় তালা আটকানো।

কিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জ্যাকবস।জানালায় থাবা দিচ্ছে জোরে জোরে।

খুব ধীরে ধীরে মুখ ফেরাল মিসেস ডেনভার।শূন্য দৃষ্টি।চেঁচানো থামেনি।

দরজা খুলুন! চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকবস।তালা লাগিয়েছেন কেন?

হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল মিসেস ডেনভার।থাবা মারল লক-বাটনের দিকে।এক সেকেণ্ড পরেই হাতল ধরে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল জ্যাকবস।টেনে-হিঁচড়ে মহিলাকে বের করে আনতে লাগল, রবিন সাহায্য করল তাকে।

সাইরেনের শব্দ কানে এল।কয়েক মুহূর্ত পরেই মোড়ের কাছে দেখা গেল ফায়ার ব্রিগেডের ইমার্জেন্সী ট্রাক।কাছে এসে টায়ারের তীব্র কর্কশ আর্তনাদ তুলে থেমে গেল গাড়ি।লাফিয়ে নেমে এল একদল কালো রেনকোট পরা লোক।এক পলক দেখেই পুরো অবস্থাটা যাচাই করে নিল তাদের অফিসার।চেঁচিয়ে আদেশ দিল।

আবার চলতে শুরু করল ট্রাক।গিয়ে থামল মোড়ের কাছে।কয়েক মুহূর্ত পরেই বন্ধ হয়ে গেল পানির ফোয়ারা।

মিসেস ডেনভারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কিশোর, রবিন, জ্যাকবস আর টমি।স্তব্ধ হয়ে গেছে মহিলা।প্রচণ্ড শক খেয়েছে।

পানি বন্ধ করলেন কি করে? একজন ফায়ারম্যানের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।জ্যাকবস।

মোড়ের কাছে মাস্টার ভালভ আছে একটা, জানাল ফায়ারম্যান।মিসেস ডেনভারের দিকে তাকাল।কোথায় চলেছিলেন?

জবাব দিল না মিসেস ডেনভার।

ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার, বলল জ্যাকবস। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। নিউমোনিয়া বাধিয়ে বসলেও অবাক হব না!

দুদিক থেকে ধরে প্রায় শূন্যে তুলে মিসেস ডেনভারকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে এল।কিশোর আর রবিন।গাড়িতে পড়ে থাকা হ্যাঁণ্ডব্যাগ খুলে ঘরের চাবি নিয়ে এসেছে।জ্যাকবস।সঙ্গে এসেছে একজন ফায়ারম্যান। একজন পুলিশ অফিসারও এসে হাজির হয়েছে পেছন পেছন।

কি হয়েছিল? জানতে চাইল অফিসার।

বসার ঘরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে মিসেস ডেনভার।কেউ গুলি করেছিল আমাকে।চাঁপা গলা। ঠোঁট নড়লই না যেন কথা বলার সময়।

ভেজা কাপড় খুলে ফেলুন জলদি, শান্ত কণ্ঠে বলল অফিসার।তারপর, ভাল বোধ করলে, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন।

মাথা ঝোকাল মিসেস ডেনভার।টলমল করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে।

তারও দাঁতে দাতে বাড়ি লাগছে, এতক্ষণে খেয়াল করল যেন কিশোর।আমারও কাপড় বদলানো দরকার!

কিছু দেখেছিলে? জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।

আমি দেখেছি, বলে উঠল রবিন।দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে তারও।গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা শব্দ...

যাও, রবিন আর কিশোরকে বলল অফিসার।আগে কাপড় বদলে এস।তারপর শুনব।

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।কাঁপতে কাঁপতে এসে ঢুকল অলিভারের বসার ঘরে।জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন অলিভার আর মুসা।দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল দুজনেই।

বুড়িটার কি অবস্থা? জানতে চাইলেন অলিভার।

ভালই, বলল কিশোর।ঠাণ্ডায় কাঁপছে, আর কিছু না।

হু, আবার রাস্তার দিকে ফিরলেন অলিভার।

তাড়াতাড়ি ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে নিল রবিন আর কিশোর।বেরিয়ে এল ঘর থেকে।আবার এসে ঢুকল মিসেস ডেনভারের ঘরে।পুলিশ অফিসার নেই, ঘটনাস্থলে চলে গেছে।

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।দুর্ঘটনাস্থলে চলল।

ফায়ার ব্রিগেডের আরও একটি ট্রাক আর দুটো পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হয়েছে।সাদা পোশাক পরা পুলিশের গোয়েন্দাও এসেছে একজন। তার সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ অফিসার।

দুই গোয়েন্দাকে দেখেই এগিয়ে এল অফিসার।

যা যা দেখেছে, শুনেছে, পুলিশকে জানাল কিশোর আর রবিন।

কেউ মহিলাকে গুলি করে থাকলে, মিস করেছে, বলল সাদা-পোশাক পরা।গোয়েন্দা।

ঠিক গুলির শব্দ না, বলল কিশোর।বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ।

গাড়িটা পরীক্ষা করছিল দুজন পুলিশ এগিয়ে এল ওরা।গুলির ছিদ্র নেই।

পানির পাইপের ওপর থেকে গাড়ি সরানর কাজে লাগল দমকল বাহিনী। সিডানের বাম্পারে শিকল বেঁধে, শিকলের অন্য মাথা আটকাল ট্রাকের পেছনের হুকে।টান দিল। সরে এল সিডান।

অন্য ট্রাকের হেডলাইটের আলো পড়েছে সিডানটা এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে। মাটিতে পড়ে থাকা লালচেমত এক টুকরো কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের।এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তুলে নিল ওটা।দেখল।ধোয়ার।কালি মনে হচ্ছে!

কি? ফিরে তাকাল গোয়েন্দা।

ধোয়ার কালি, আবার বলল কিশোর।শব্দটা হবার পর গাড়ির হুডের তলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

দ্রুতপায়ে সিডানের কাছে এগিয়ে গেল গোয়েন্দা বনেট তুলে ফেলল।তার।পাশে দাঁড়িয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল পুলিশ অফিসার।কিশোরও এসে দাঁড়াল পাশে।

ইঞ্জিন-ব্লকের ওপর পড়ে আছে কয়েক টুকরো লালচে কাগজ, আর পোড়া আধপোড়া কিছু তুলো।পুড়ে গেছে রেডিয়েটর হোস, ফ্যানের বেল্ট ছেঁড়া।

না, গুলি করেনি, মাথা নাড়াল সাদা-পোশাক পরা গোয়েন্দা।বিস্ফোরণ।বোমা ফাটানো হয়েছে।

ঘটাং করে বনেটটা আবার নামিয়ে রাখল গোয়েন্দা।নিয়ে যাও! ট্রাকের ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল।পুলিশ গ্যারেজে নিয়ে রাখবে।

জ্যাকবস এসে হাজির হয়েছে আবার।কিশোরের প্রায় ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে টমি গিলবার্ট।বেড়াল-মানব এনড্রুও এসে হাজির হয়েছে, পরনে পাজামা, গায়ে একটা কম্বল জড়ানো।

ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল! বলে উঠল এনড্রু।

ঘুরে চাইল গোয়েন্দা।কোন শত্রুছিল মহিলার?

ছিল মানে? জবাবটা দিল জ্যাকবস।পুরো এক বাড়ি ভর্তি শত্রু।তবে ওদের কেউ বোমা মেরে মারতে চায় ওকে, মনে হয় না? এত শত্রুতা নেই।

আপনি? জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা। আমার নাম ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যাকবস, হাই তুলল স্টকব্রোকার।মিস্টার অলিভারের বাড়িতে ভাড়া থাকি।

আপনি কিছু দেখেছেন?

না।বিস্ফোরণের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।বেরিয়ে এসে দেখি, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে।পাইপ ছেঁড়া, ফোয়ারার মত পানি ছিটকে বেরোচ্ছে।এই ছেলেগুলোর সাহায্যে মহিলাকে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বের করলাম, আবার হাই তুলল জ্যাকবস।রাতে ভাল ঘুম হয়নি।..গই, ঘুমোইগে।..যদি আপনার।কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, দুপুরে আসবেন।তার আগে আর ঘুম থেকে উঠছি না আমি।হাই তুলতে তুলতে চলে গেল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে জ্যাকবসের গমন পথের দিকে তাকাল পুলিশ অফিসার।তারপর তাকাল অলিভারের বাড়িটার দিকে।বিড়বিড় করল, আশ্চর্য? গত দুদিনে।জায়গাটাতে কয়েকটা অঘটন ঘটল পর পর! মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

পুবের আকাশে ধূসর আলো।সূর্য ওঠার দেরি নেই।

চল, আমরাও যাই, রবিনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর।ঘুম পেয়েছে।

চল, বড় করে হাই তুলল রবিন।

.

১৩.

রাতে ঘুম হয়নি, তাছাড়া প্রচণ্ড উত্তেজনা গেছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইছে অলিভারের।বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি।তিন গোয়েন্দাও ঘুমোতে গেল।

অনেক বেলায় উঠলেন অলিভার।নাশতা তৈরি করে ডাকলেন ছেলেদের।

নাশতা শেষ হল।বসার ঘরে চলে এল সবাই।টেলিভিশন অন করে দিল।কিশোর।খালি চত্বর।পুরো বাড়িটা নীরব।

ব্যাংকে যেতে হবে আমাকে, বললেন অলিভার।দশ হাজার ডলার তুলব।ছোট ছোট নোটে। তোমরা কেউ যাবে আমার সঙ্গে? এস না? খুশি হব।

নিশ্চয় যাব, বলল কিশোর।তবে, কি করতে যাচ্ছেন, পুলিশকে জানিয়ে রাখলে ভাল হত না?

না।ঝুঁকি কিছুতেই নেব না আমি।বিপদ দেখলে হাউণ্ডটা ধ্বংসই করে ফেলতে পারে চোর। ওর নির্দেশ মানতেই হচ্ছে আমাকে।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর, গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে।রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি।বড় একটা সুটকেস এনে গাড়িতে তুলল ড্রাইভার।পেছনেই এল মিসেস ডেনভার।

আপনার ম্যানেজার চলে যাচ্ছে, চোখ না ফিরিয়েই বলল কিশোর।

সান্তা মনিকায় বুড়িটার এক বোন থাকে, বলল অলিভার।অসুস্থ হলে, কিংবা কোনরকম বিপদে পড়লে, ওখানেই গিয়ে ওঠে।

চলতে শুরু করল ট্যাক্সি।দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মোড়ের দিকে।

ভাল বিপদে পড়েছে এবার, টিপ্পনী কাটল মুসা।খালি ছোঁক ছোঁক করে লোকের পেছনে। এইবার দিয়েছে টাইট...

কাঁচ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দে থেমে গেল মুসা।

আগুন! আগুন! চেঁচিয়ে উঠল কেউ।আগুন লেগেছে!

চোখের পলকে দরজার কাছে ছুটে গেল চারজনে।দরজা খুলে বেরিয়ে এল।ব্যালকনিতে।

চতুরের একপাশে ধোঁয়া।জ্যাকবসের ঘরের জানালা দিয়ে বেরোচ্ছে।একটা লোহার চেয়ার তুলে নিয়ে দমাদম পিটিয়ে শার্সির কাঁচ ভাঙছে টমি।পরনে ঘুমানর পোশাক।খালি পা। ঘাড়ের কাছের চুল খাড়া হয়ে গেছে।

মাই গড! চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার।ছুটে আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করবেন।

রবিন আর কিশোর নড়ার আগেই সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গেছে মুসা।লাফিয়ে এসে নামল চত্বরে।পুলের ধার থেকে আরেকটা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুটল।

ঝট করে, বেড়াল-মানবের ঘরের দরজা খুলে গেল।প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল।এনড্রু।

মিস্টার জ্যাকবস! ভাঙা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

জবাব নেই।

তাড়াতাড়ি চৌকাঠে পড়ে থাকা কাঠের টুকরো সরিয়ে ফেলতে লাগল মুসা।পর্দায় আগুন ধরে গেছে।অনেকখানি পুড়ে গেছে ইতিমধ্যেই।থাবা দিয়ে নেবানর চেষ্টা করল পর্দার আগুন।

এই যে! চিৎকার শোনা গেল কিশোরের।পাশে কুলুঙ্গিতে হুকে ঝোলানো অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটা দেখতে পেয়েছে।ছুটে গিয়ে ওটা খুলে নিয়ে এল সে।

তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ উঠল।যন্ত্রের মুখ থেকে সাদা ফেনামত জিনিস ছুটে গিয়ে পড়তে থাকল জ্বলন্ত পর্দায়।ছ্যাক করে উঠল আগুনের শিখা, নিবে গেল।চেয়ার দিয়ে বাড়ি মেরে জানালার পাল্লার ছিটকিনি ভেঙে ফেলল মুসা, ঝটকা দিয়ে দুপাশে সরে গেল পাল্লাদুটো। চৌকাঠে উঠে বসল টমি, তার পাশেই কিশোর।জানালার ঠিক নিচেই রয়েছে সোফা, জ্বলছে।পাশেই ক্রিসমাস গাছ, ওটাতেও আগুন ধরে গেছে প্রায়।নির্বাপক যন্ত্রের মুখ ঘোরাল কিশোর, একনাগাড়ে ফেনা নিক্ষেপ করে গেল আগুনের ওপর।

মুসা আর রবিনও উঠে বসেছে চৌকাঠে।ধোয়ার জন্য শ্বাস নিতে পারছে না ঠিকমত, চোখ জ্বালা করছে।চেঁচিয়ে ডাকা হল জ্যাকবসের নাম ধরে, কিন্তু কোন।সাড়া এল না।

লাফিয়ে ঘরের মেঝেতে নেমে পড়ল কিশোর আর মুসা।ঝুঁকে চোখ বাঁচানর চেষ্টা করতে করতে এগোল ধোয়ার ভিতর দিয়ে।

বসার ঘর আর শোবার ঘরের দরজার মাঝামাঝি পাওয়া গেল জ্যাকসকে।উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।

জলদি বের করে নিয়ে যেতে হবে ওকে! ধোয়া ঢুকে যাচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে, কেশে উঠল মুসা।নিচু হয়ে বাহু ধরে টেনে চিত করল জ্যাকসকে।জোরে চড় লাগাল দুই গালে।

নড়লও না জ্যাকবস।

এখানে হবে না! চেঁচিয়ে বলল কিশোর।বের করে নিয়ে যেতে হবে!

দুদিক থেকে দুহাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে জ্যাকবসকে নিয়ে চলল দুজনে।ততক্ষণে নেমে পড়েছে রবিন আর টমি।একজন ছুটে গেল দরজা খুলতে, আরেকজন সাহায্য করতে এল মুসা আর কিশোরকে।

জ্যাকবসের পায়ের দিকে তুলে ধরল রবিন।তিনজনে মিলে বয়ে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

কাশছে টমি।খুলে ফেলল দরজা।

দম বন্ধ হয়ে আসছে তিন গোয়েন্দার।ভারি দেহটাকে বয়ে নিয়ে কোনমতে এসে পৌঁছুল দরজায়।হাত লাগাল টমি।জ্যাকবসকে নিয়ে আসা হল পুলের ধারে।চিত করে শুইয়ে দেয়া হল।জ্যাকবসের মুখে এসে পড়ছে রোদ।ফেকাসে চেহারা, রক্ত নেই যেন মুখে।

ঈশ্বর! বিড়বিড় করলেন অলিভার।

স্থির দৃষ্টিতে জ্যাকবসের মুখের দিকে চেয়ে আছে এনড্রু।ও কি..ও কি...।

উবু হয়ে বসে লোকটার বুকে কান পেতেছে মুসা।সোজা হয়ে বলল, না, বেঁচেই আছে।

পৌঁছে গেল দমকল বাহিনী।অক্সিজেন আর অ্যামবুলেন্স নিয়ে এসেছে।এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে জ্যাকবসের ঘর থেকে।সেদিকে ছুটে গেল কয়েকজন ফায়ারম্যান।

ছুটে এসে চত্বরে ঢুকল দমকল বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন।সোজা ছুটে গেল জ্যাকবসের ঘরের দিকে।

অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে দুজন ফায়ারম্যান এসে বসল জ্যাকবসের দুপাশে।নাকে মুখে চেপে ধরল মাস্ক। ধীরে ধীরে চোখ মেলল স্টকব্রোকার। মিটমিট করল। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে গলার ভেতর থেকে।দুর্বল একটা হাত বাড়িয়ে ঠেলে মাস্কটা নাকের ওপর থেকে সরিয়ে দিল সে।

ভয় নেই, মিস্টার, বলল একজন ফায়ারম্যান।খানিকটা ধোয়া ঢুকে গিয়েছিল ফুসফুসে, আর কিছু না।

উঠে বসার চেষ্টা করল জ্যাকবস।

না না, উঠবেন না, বাধা দিল আরেক ফায়ারম্যান।ইমার্জেন্সীতে নিয়ে যাব আপনাকে।

প্রতিবাদ করবে মনে হল, কিন্তু শেষে কি মনে করে করল না জ্যাকবস।শুয়ে পড়ল আবার পাথরের চত্বরে।

জর্জ, স্ট্রেচারটা নিয়ে এস, সঙ্গীকে বলল এক ফায়ারম্যান।

স্ট্রেচার এল।তাতে তুলে নেয়া হল জ্যাকসকে।শান্ত রইল সে।কোনরকম বাধা দিল না। ধূসর একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হল তার দেহ।স্ট্রেচার তুলে।নিল দুজন ফায়ারম্যান।

ওর সঙ্গে কারও যাওয়া দরকার, বলল এনড্রু।

আমার ভাগ্নে, দুর্বল গলায় বলল জ্যাকবস। আমার ভাগ্নেকে একটা খবর দেবেন। ও শুনলেই চলে আসবে।

অ্যামবুলেন্সে তোলা হল জ্যাকসকে। সাইরেন বাজিয়ে চলে গেল গাড়ি।

জ্যাকবসের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। সেই পুরানো কাহিনী। আধপোড়া একটা সিগারেটের টুকরো ধরে আছে দুআঙুলে, দেখাল। সিগারেট জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কোনভাবে সোফায় পড়েছে টুকরোটা, আগুন ধরে গেছে পর্দায়...

কপাল ভাল ওর, বলে উঠল টমি। এখনও খালি পায়েই রয়েছে। চেহারা ফেকাসে। সময়মত দেখতে পেয়েছিলাম...

হ্যাঁ, সত্যিই ভাল, মাথা ঝোঁকাল ক্যাপ্টেন। আরেকটু হলেই আগুন ধরে যেত ক্রিসমাস গাছটায়। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ত আগুন।

সিগারেট জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল? বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর।

অনেকেই এ-কাণ্ড করে, খোকা, বলল ক্যাপ্টেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু একটা গামলার সমান অ্যাশট্রে আছে ওর, ক্যাপ্টেনের কথা মানতে পারছে না গোয়েন্দাপ্রধান। ওতে সিগারেট কেন, জ্বলন্ত কয়লার টুকরো রেখে দিলেও ভয় নেই। সিগারেটটা অ্যাশট্রের বাইরে পড়ল কি করে?

ঘুমের ঘোরে হয়ত অ্যাশট্রের ভেতরে রাখতে চেয়েছিল। ভেতরে না রেখে, বাইরেই ফেলেছে। ব্যস, ধরে গেছে আগুন। এটা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল রবিন। খুব নাকি ঘুম পেয়েছিল তার। সারারাত ঘুমাতে পারেননি। দুপুর পর্যন্ত টানা ঘুম দেবেন, বলেছেন সকালে। হয়ত এসে সোফাতেই শুয়ে পড়েছিলেন, সিগারেট ধরিয়েছিলেন। তারপর আর চোখ খুলে রাখতে পারেননি।

কিন্তু ওকে মাঝের দরজায় পেয়েছি, বেডরুমের দিকে মুখ। সোফায় ঘুমোলে, ঘুম থেকে উঠে বারান্দার দরজার দিকে না গিয়ে বেডরুমের দরজায় গেল কেন? বেরোনর চেষ্টা না করে ঘরের আরও ভেতরে গেল কেন? ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। কিশোর। আপনার কি মনে হয়?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘর ভর্তি ধোয়া, দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল বেচারা! জবাব দিল ক্যাপ্টেন। রওনা দিয়েছিল বেডরুমের দরজার দিকে। এগোতে পারেনি বেশি দূর। ধোয়া কাহিল করে ফেলেছিল।

পোড়া সোফার অবশিষ্ট বয়ে এনে ধুপ করে বাইরে ফেলল দুজন ফায়ারম্যান।

যা নোংরা হয়েছে, পরিষ্কার করতে গেলে বোঝা যাবে, বলে উঠল বেড়াল মানব।

মিসেস ডেনভার এ-অবস্থা দেখলে, তাকেও আবার হাসপাতালে পাঠানর দরকার হবে, হাসল টমি।গেল কোথায় মহিলা? এত হৈ চৈয়েও দেখা নেই!

খানিক আগে ট্যাক্সিতে করে চলে গেছে, বললেন অলিভার।যাবে আর কোথায়? বোনের ওখানে গেছে হয়ত।

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর।মিস্টার জ্যাকবসকে কোথায় নেবে?

সেন্ট্রাল হাসপাতালে।প্রাথমিক চিকিৎসা করলেই চলবে বুঝলে, তাই করে ছেড়ে দেবে ডাক্তাররা।অবস্থা খারাপ দেখলে ভর্তি করে নেবে।

সেন্ট্রাল হাসপাতাল! চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে।মিস ল্যাটনিনাকেও ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।কিন্তু মিস্টার জ্যাকবস-জ্যাকবসও ওখানে...

ওখানেই তো নেবে, প্রথমে বাধা দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন। ওটা ইমার্জেন্সী হাসপাতাল, সরকারী।রোগী পয়সা খরচ করতে রাজি থাকলে দেবে কোন প্রাইভেট ক্লিনিকে পাঠিয়ে।

আমি সে কথা বলছি না, মাথা নাড়ল কিশোর।সিগারেটের ব্যাপারে, আগুনের ব্যাপারে এত সতর্ক লোকটা! সিগারেট খাবার সময় অ্যাশট্রে সঙ্গে রাখে! অথচ অসাবধানে সে-ই আগুন ধরিয়ে দিল ঘরে! নাহ, বোঝা যাচ্ছে না!

.

১৪.

জিনের আসর হয়েছে বাড়িটাতে! দমকল বাহিনী চলে যেতেই ঘোষণা করল এনড্রু। প্রথমে লারিসা, তারপর মিসেস ডেনভার, এখন আবার জ্যাকবস!

সব কিছুর মূলে ওই চুরি, বললেন অলিভার।আড়চোখে টমির দিকে তাকালেন।লাউঞ্জে একটা চেয়ার বের করে তাতে আধশোয়া হয়ে আছে।চোখ আধবোজা, বোধহয় রোদের দিকে সরাসরি চেয়ে আছে বলেই।তিন রাত আগেও এসব কিছুই ঘটেনি।চোরটা গেল চত্বর দিয়ে, শুরু হয়ে গেল যত গণ্ডগোল।

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।এর একটাই মানে।ছায়াশ্বাপদটা রয়েছে

ছায়া–কি বললে? ভুরু কোঁচকালেন অলিভার।

ছায়াশ্বাপদ, হাউটার নাম রেখেছি আমি।বাংলা শব্দ।ইংরেজিতে ইনভিজিবল ডগ বলতে পারেন।হ্যাঁ, যা বলছিলাম।এ-বাড়ির সীমানার মধ্যেই কোথাও রয়েছে ছায়াশ্বাপদ।আর চোরও নিশ্চয় এ-বাড়িরই কেউ।

কি বলছ, খোকা? চোখ কপালে উঠেছে বেড়াল-মানবের।এ-বাড়িতে কুকুর।নেই, খালি বেড়াল।

জ্যান্ত কুকুর না ওটা, বললেন অলিভার।ক্রিস্টালে তৈরি একটা মূর্তি।আর্টিস্ট জ্যাক ইলিয়ট বানিয়েছিল।সোমবার রাতে ওটার জন্যই এসেছিল চোর, জ্যাকের বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে।

খুকখুক করে হেসে উঠল এনড্রু। তাই বলুন! মিসেস ডেনভার কবেই এসে বলেছে আমাকে, আপনি একটা কুকুর আনবেন।আমার বেড়াল যেন সাবধানে।রাখি।হাহ হাহ! এখন শুনছি একটা কাঁচের কুকুর! হাহ!

কাঁধ ঝাঁকালেন অলিভার।ওই বুড়িটার জন্যে আর গোপন রইল না কিছু! কুকুরটার কথা লিখেছি ডায়েরীতে।আমার কাগজপত্র ঘেঁটেছে।নিশ্চয় ওটা পড়েছে বুড়ি।আপনাকে যখন বলেছে, আরও অনেককেই হয়ত বলেছে।জানাজানি হয়ে গেছে।চোরের কানেও গেছে কথাটা।

হু! আমাকে সন্দেহ-টন্দেহ করছেন না তো? হাসি উধাও হয়ে গেছে বেড়াল মানবের মুখ থেকে।যা-ই হোক, আর আমি এখানে থাকছি না।যা শুরু হয়েছে, প্রাণের নিরাপত্তাই নেই। কখন দেবে বিষ খাইয়ে, কিংবা বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে, কে জানে! তার চেয়ে কোন মোটেলে চলে যাব।

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল এনড্রু।বেরিয়ে এল শিগগিরই।এক হাতে সুটকেস, আরেক হাতে পোষা কালো বেড়ালটা।বিকেল পাঁচটায় একবার আসতেই হচ্ছে।বেড়ালগুলো আসবে, আমি না থাকলে না খেয়ে ফিরে যাবে।ওদেরকে মোটেলটা চিনিয়ে দেব নিয়ে গিয়ে।যদি কোন কারণে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার পড়ে, উইলশায়ার ইন-এ খোঁজ করবেন।ফ্ল্যাটটা ছাড়ছি না।এখানকার পরিস্থিতি শান্ত হলেই ফিরে আসব আবার।

চলতে গিয়েও কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল বেড়াল-মানব।অলিভারের দিকে তাকাল।আমি নেই, চট করে আবার আমার ঘরে ঢুকে পড়বেন না।তল্লাশি চালাতে চাইলে, পুলিশ এবং সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসবেন।

গটগট করে হেঁটে চলে গেল এনড্রু।খানিক পরেই গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল।

চাইলে আমার ঘরে খুঁজে দেখতে পারেন, মিস্টার অলিভার, বলল টমি।গিলবার্ট।দুপুরে বাইরে যাব, কাজ আছে।তখন ঢুকতে পারেন ইচ্ছে করলে।সার্চ ওয়ারেন্ট লাগবে না।

দুপুরে? ভুরু কোঁচকাল রবিন।আপনার ডিউটি রাতে না?

আজ দিনের শিফটে কাজ করব, বলল টমি।আমার এক কলিগ অসুস্থ।তার কাজটা চালিয়ে নিতে হবে।

আমি জানি, আপনার ঘরে নেই ছায়াশ্বাপদ, শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর।এ-বাড়ির কোন ঘরেই নেই।

একটু যেন হতাশ মনে হল টমিকে।কাঁধ ঝাঁকাল।ঘুরে গিয়ে ঢুকে পড়ল নিজের ঘরে।

এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে? জানতে চাইলেন অলিভার।

সহজ, বলল কিশোর। তাহলে মিসেস ডেনভারের শকুনি-চোখে এড়াতো না জিনিসটা। কার ঘরে কোথায় কোন সুতোটা আছে, আমার মনে হয় তা-ও তার জানা। নকল চাবি বানিয়ে মালিকের ঘরে ঢোকার যার সাহস আছে, ভাড়াটেদের ঘরে সুযোগ পেলেই ঢুকবে সে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সবারই বাক্স-পেটরা ড্রয়ার ঘাটে সে, আমি শিওর।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

তবে, এর মানে এই নয়, কাছাকাছি নেই মূর্তিটা। নইলে, এখান থেকে লোকজন সরাতে চাইছে কেন চোর? গতকাল মিস ল্যাটনিনাকে বিষ খাওয়াল। আজ বোমা ফাটাল মিসেস ডেনভারের গাড়িতে। মিস্টার জ্যাকবসের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে খেদাল। ভয়েই পালাল বেড়াল-মানব-মিস্টার অলিভার, জ্যাকবসের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। ও হয়ত কিছু জানাতে পারবে। কি করে আগুন। লাগল, হয়ত কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে।

ভ্রূকুটি করল রবিন। তোমার ধারণা, ওই আগুন লাগা নিছক দুর্ঘটনা নয়?

সম্ভবত।

তাহলে? কে লাগিয়েছে আগুন? টমি? সবার আগে ও-ই হাজির হয়েছে। ওকে। আসতে দেখেনি কেউ। হয়ত, দেয়াল গলে জ্যাকবসের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। আগুন। লাগিয়ে আবার দেয়াল গলেই বেরিয়ে এসেছে। তারপর যেন বাঁচাচ্ছে জ্যাকবসকে, এরকম অভিনয় করে গেছে।

দূর! প্রতিবাদ করল মুসা। অতিকল্পনা!

ব্যাপারটা প্রমাণ করে ছাড়ব আমি, দৃঢ় কণ্ঠে বলল রবিন। ডক্টর রোজারের সঙ্গে কথা বলব। ডক্টর লিসা রোজারকে চেনে কিশোর আর মুসাও। রবিনের দূর সম্পর্কের খালা। রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজির প্রফেসর, হেড অভ দ্য ডিপার্টমেন্ট। প্রেততত্ত্ব আর ডাকিনী বিদ্যার ওপর প্রচুর পড়াশোনা আছে, ওসবের ওপর গবেষণা করছেন এখন। আগুন লাগাক বা না লাগাক, দেয়াল গলে যে টমিই আসে-যায়, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিভাবে কাজটা করে সে, জানতে হবে।

ওসব ভূত-প্রেতের মধ্যে আমি নেই, বলল মুসা। বাস্তব কাজ করব। টমিকে অনুসরণ করব আজ দুপুরে। কোথায় যায়, দেখব। সত্যিই বাজারে কাজে যায়। কিনা, দেখতে হবে। আর, এনড্রুর ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব। দেখে আসব, সত্যি উইলশায়ার ইন-এ গিয়েছে কিনা।

আমি যাব হাসপাতালে, ঘোষণা করল কিশোর। কয়েকটা হাসপাতাল ঘুরে আসতে হবে হয়ত কিছু তথ্য দরকার। আশা করছি, ল্যাটনিনা আর জ্যাকবসের কাছ থেকে জানা যাবে কিছু।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যেন অলিভারের, আরে! আমার ব্যাংকে যাওয়া! তোমাদের একজন যাবে বলেছিলে। এত টাকা একা আনার সাহস আমার নেই, এখন!

যাব, তবে আগে কাজগুলো সেরে আসি, বলল কিশোর।

ততক্ষণ একা থাক! একটা লোক নেই এতবড় বাড়িটায়! আমি পারব না! আঁতকে উঠেছেন অলিভার।

আপনার কোন বন্ধু নেই?

ওই মিকো ইলিয়ট, সে-ই কাছাকাছি থাকে।

তাকেই ডাকুন।বসে বসে গল্প করুন দুজনে।আমরা বেশি দেরি করব না।

আবার বসার ঘরে ঢুকল চারজনে।ফোন করতে গেলেন অলিভার।কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে, কথা দিল মিকো।

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল রবিন।বেরিয়ে এল ঘর থেকে।রুক্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলল।

মিনিট বিশেক পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছুল রবিন।প্রফেসর লিসা রোজারকে তার অফিসেই পাওয়া গেল।সুন্দর চেহারা।বয়েস চল্লিশ মত হবে।

টাকমাথা, গোলগাল চেহারার এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলছেন লিসা রোজার, রবিনের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন।আরে, রবিন! তুই হঠাৎ!...আয়, আয়!

ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রবিন।কেমন আছ, খালা?

ভাল।তোরা সব কেমন? তোর মা কেমন আছে?

ভাল।তারপর? কি মনে করে? খালাকে দেখতে আসার সময় হল তোর?

খালা, একটা কাজ।মানে, ইয়ে... দ্বিধা করছে রবিন।টাকমাথা ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। একটা কথা...

ইনি প্রফেসর ডোনাল্ড রস, পরিচয় করিয়ে দিলেন মহিলা।অ্যাপলজির প্রফেসর।ডোনাল্ড, ও শেলি, মানে আমার বোনের ছেলে।ওর কথা বলেছি তোমাকে।গোয়েন্দাগিরির শখ।

তাই নাকি? খুব ভাল শখ, হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রফেসর রস।

প্রফেসরের সঙ্গে হাত মেলাল রবিন।

হ্যাঁ, কি বলছিলি, বল, বললেন ডক্টর রোজার।

খালা, একটা উদ্ভট ঘটনা, দ্বিধা যাচ্ছে না রবিনের।মানে ভূতুড়ে...

এত দ্বিধা করছিস কেন? ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই আমার কারবার, জানিসই তো, ডেস্কে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা চিঠি দেখালেন মহিলা।এই যে চিঠিটা, ডুবুক থেকে এক লোক পাঠিয়েছে।তার বোনের ভূত নাকি তাড়া করে।তাকে আজকাল।মজার ব্যাপার হল, তার কোন বোনই নেই, ছিলও না কখনও।

যতসব বদ্ধ পাগল নিয়ে তোমার কারবার, লিসা, চেয়ারে হেলান দিলেন রস।ইয়াংম্যান, ভূতের কথা কি যেন বলছিলে?

অলিভারের বাড়িতে ভূতুড়ে যা যা ঘটেছে, সব খুলে বলল রবিন।গির্জায় পাদ্রীর প্রেতাত্মা দেখেছে কিশোর, সে কথাও বাদ দিল না।

হুমম! গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন লিসা রোজার।আমি গিয়েছিলাম ওই গির্জায়।

তুমি শুনেছ প্রেতাত্মার কথা? জিজ্ঞেস করল রবিন।

শুনেছি, বললেন লিসা রোজার।যেখানেই এই ধরনের গুজব শুনি, যাই।সরেজমিনে তদন্ত করি।তোর বন্ধু কিশোর যাকে দেখেছে, তার সঙ্গে বছর তিনেক আগে মারা যাওয়া পাদ্রীর নাকি মিল আছে।লম্বা সাদা চুল, বৃদ্ধ-।খোঁজ নিয়ে জেনেছি, শুধু হাউসকীপার তামারা ব্রাইসই দেখেছে ভূতটাকে।তামারার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছি।আয়ারল্যাণ্ডের এক ছোট্ট শহর ডুঙ্গালওয়ে থেকে এসেছে সে।ওখানকার গির্জায় ভূত আছে, অনেকেই বলে।ভূতের ব্যাপারে রীতিমত বিখ্যাত জায়গাটা।বহুদিন আগে নাকি কোথায় যাবার জন্যে জাহাজে চেপেছিল এক পাদ্রী।সাগরে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যান তিনি।লোকে বলে, তারই প্রেতাত্মা এসে ঠাই নিয়েছে ডুঙ্গালওয়ে গির্জায়।গিয়েছিলাম।কয়েক রাত কাটিয়েছি ওখানে।কোন ভূত-টুত আমার নজরে পড়েনি।ওখান থেকে এসেছে তো, গির্জায় পাদ্রীর ভূত থাকবেই, বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে হয়ত তামারা ব্রাইসের।যাই হোক, অলিভারের।ঘরে ঢোকে যে ছায়াটা, ওটা পাদ্রীর প্রেতাত্মা নয়।

আমারও তাই ধারণা।ও নিশ্চয় টমি গিলবার্ট।

সামনে ঝুঁকলেন লিসা রোজার।বলছিস, দুবার ছায়াটা দেখেছে কিশোর।এবং দুবারই টমি তার ঘরে সেই সময় ঘুমিয়েছিল?

হ্যাঁ, ছিল।

মৃদু হাসলেন ডক্টর রোজার।চমৎকার! নীরবে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে ছেলেটা!

মিস্টার অলিভারের কাছে ব্যাপারটা মোটেই চমৎকার নয়, গম্ভীর হয়ে গেছে।রবিন।কিভাবে করে টমি?

উঠে গিয়ে ফাইল ক্যাবিনেট খুললেন লিসা রোজার।ফিতে বাধা কয়েকটা ফাইল বের করে এনে রাখলেন ডেস্কে।আমার মনে হয়, ঘুমের ঘোরে ছায়া শরীরে বেরিয়ে আসে সে।ঘুরে বেড়ায়।

হাঁ হয়ে গেল রবিন।

আবার চেয়ারে বসলেন প্রফেসর রোজার।একটা ফাইল খুললেন।ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালিয়েছি আমরা এ-ব্যাপারে, তবে খুব কমই সে-সুযোগ পাওয়া যায়।এসব যারা করে, লোককে জানিয়ে করে না।ল্যাবরেটরিতে আসা তো দূরের কথা।অনেক খোঁজখবর নিয়ে,

এমন এক-আধজনকে বের করে, অনেক বলে কয়ে নিয়ে আসতে হয়।কারও কারও ধারণা, অন্য কাউকে জানালে তার এ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।গত বছর এসেছিল এক মহিলা, সাধারণ এক গৃহবধূ।মনট্রোজে থাকে।ওর নাম বলতে চাই না।

মাথা ঝোকাল রবিন।

মহিলার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, বললেন আবার লিসা রোজার।ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে এবং সেটা সত্যি।

তারমানে, আগ্রহে সামনে ঝুঁকল প্রফেসর রস।তুমি বলতে চাইছ, মহিলা যা দেখে, সেটা পরে সত্যি হয়?

ঠিক তা নয়।কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি, ফাইলের কাগজে চোখ বোলালেন লিসা রোজার। ঘুমের ঘোরেই আকনে তার মায়ের জন্মদিনের উৎসবে হাজির হয়েছিল ওই মহিলা।সে সবাইকে দেখেছিল, তাকে কেউ দেখেনি।পরিষ্কার বলেছে সে, কি কি দেখেছে।তার দুই বোন সেদিন সেই উৎসবে হাজির ছিল।মাঝারি সাইজের একটা কেক, সাদা মাখনের একটা প্রলেপ, তার ওপর লাল চিনি।দিয়ে লেখা ছিল মহিলার মায়ের নাম।কটা মোম কোন কোন রঙের ছিল, ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে সে।রাতে স্বপ্ন দেখেছে।সকালে উঠে তার স্বামীকে বলল ব্যাপারটা।হেসে উড়িয়ে দিল স্বামী।দিন কয়েক পরেই একটা চিঠি আর কয়েকটা ছবি এল। মহিলার মায়ের কাছ থেকে। জন্মদিনের উৎসবে তোলা, রঙিন-ফটোগ্রাফ।যা যা স্বপ্নে দেখেছিল মহিলা, ঠিক মিলে গেল ছবির সঙ্গে।অস্বস্তিতে পড়ে গেল স্বামী বেচারা।এরপর আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটল ওরকম।কোথাও গিয়েছে, হয়ত স্বপ্নে দেখে মহিলা।পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তার বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যায় সব, অথচ ওই জায়গায় সশরীরে কখনও যায়নি মহিলা।রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়ল।স্বামী। খোঁজখবর নিয়ে শেষে একদিন আমার কাছে নিয়ে এল স্ত্রীকে।

ল্যাবরেটরিতে মহিলার ওপর পরীক্ষা চালিয়েছ? জিজ্ঞেস করল রবিন।

হ্যাঁ।কয়েকদিন ল্যাবরেটরির একটা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম মহিলাকে।একটা মাত্র দরজা ঘরটার।রাতে বন্ধ করে দিতাম।চোখ রাখতাম বিশেষভাবে তৈরি।একটা ফোকর দিয়ে। ওখান দিয়ে পুরো ঘরটাই ভালমত দেখা যায়।প্রথম রাতে।মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে তার ঘরে ঢুকলাম।দেয়াল-তাক আছে ওঘরে কয়েকটা।সবচেয়ে ওপরের তাকে রাখলাম মুখবন্ধ একটা খাম! ভেতরে এক টুকরো কাগজে দশ অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখেছি।সংখ্যাটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।খামটা রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। চোখ রাখলাম ফোকরে। যতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মহিলা, নড়িনি ওখান থেকে। একবারও ঘুম ভাঙেনি তার।সারারাতে।সকালে উঠে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে কি কি আছে।প্রথমেই খামটার কথা বলল মহিলা।রঙ, আকার সব ঠিক ঠিক।তবে ভেতরে কি আছে, বলতে পারল না।পরের রাতে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লে তার অজান্তে আবার রেখে এলাম খামটা, আরেকটা তাকে।খামের ভেতরের কাগজটা সেদিন বের করে নিয়েছি, ওটা

রাখলাম খামের ওপরে, নাম্বার লেখা পিঠটা ওপরের দিকে।ভোরে উঠে জিজ্ঞেস করতেই কাগজটার কথা বলল মহিলা।ঠিক বলে দিল নাম্বারটা।

সেদিনও সারারাত চোখ রেখেছিলে ওর ওপর? বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।রবিন।রাতে একবারও ঘুম ভাঙেনি মহিলার? কোন ফাঁকে উঠে দেখে নেয়নি তো নাম্বারটা?

আমি নিজে চোখ রেখেছি ফোকরে, বললেন প্রফেসর। মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাইনি। একবারও ঘুম ভাঙেনি মহিলার, বিছানা ছেড়ে ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না।তবে, নিশ্চয় তার শরীরের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল ছায়া শরীর।ঘুরে বেড়িয়েছিল সারা ঘরে।

কি যেন ভাবছে রবিন।বলল, কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণ হয় না!

নিশ্চয় প্রমাণ হয়, ছায়া শরীরে মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিল টমি, জবাবটা দিলেন ডক্টর রস।মান্দালার কথা জেনেছে সে ওভাবেই।

কিন্তু তার ছায়া দেখা গেছে, প্রতিবাদ করল রবিন।মহিলার দেখা যায়নি।

বেশ, বললেন লিসা রোজার।আরেকটা ঘটনার কথা বলছি।অরেঞ্জে বাস করে এক লোক, আমার এক রোগী।সারাজীবন স্বপ্নে যা যা দেখেছে, সব সত্যি ঘটেছে।মনট্রোজের ওই গৃহবধূর মত।তবে, মহিলার সঙ্গে একটা পার্থক্য আছে, তার ছায়া শরীর দেখা গেছে, আবার ফাইল দেখলেন প্রফেসর।হলিউডে লোকটার এক বন্ধু আছে।আসল নাম বলব না, ধরে নিই, তার নাম জোনস।একরাতে, জোনস তার ঘরে বসে বই পড়ছে।হঠাৎ জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।তার কুকুরটা।জোনস ভাবল, নিশ্চয় আঙিনায় চোর ঢুকেছে।দেখতে চলল সে।হলঘরেই দেখা হয়ে গেল অরেঞ্জে বাস করে যে, সে বন্ধুর সঙ্গে।এতরাতে বন্ধুকে দেখে অবাক হল জোনস।কেন এসেছে, জানতে চাইল।কোন কথা বলল না বন্ধু। নিঃশব্দে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।বোকা হয়ে গেল যেন জোনস।শেষে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সে-ও উঠে এল।কোথাও নেই তার বন্ধু।একেবারে হাওয়া।তখুনি অরেঞ্জে ফোন করল জোনস।বাড়িতেই পাওয়া গেল বন্ধুকে।কয়েকবার রিঙ হবার পর ফোন ধরেছে।ঘুমজড়িত গলা, স্পষ্ট।কেন ফোন করেছে, জানতে চাইল বন্ধু।জানাল জোনস।বন্ধু, আশ্চর্য হল।সে-ও নাকি স্বপ্ন দেখছিল জেনসকে দেখেছে, শোবার ঘরে বসে বই পড়ছে।কুকুর ডেকে উঠল।জোনস এসে ঢুকল হলঘরে।বন্ধু এত রাতে কেন এসেছে জিজ্ঞেস করল।সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল সে।আর কিছু মনে নেই তার।এর পর পরই টেলিফোন ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

আশ্চর্য! বিড়বিড় করে বলল রবিন।

হ্যাঁ, মাথা ঝোকালেন লিসা রোজার।আশ্চর্যই, এবং ভয় পাওয়ার মত।স্বপ্নে যে ঘুরে বেড়ায়, ঘুম থেকে উঠে সে-ও ভয় পায়, তাকে যারা ঘুরতে দেখে, তারাও।

টমির ছায়া দেখে ভয় পান মিস্টার অলিভার, সন্দেহ নেই, বলল রবিন।কিন্তু ঘুম থেকে উঠে টমি ভয় পায় বলে তো মনে হয় না!

তার কেসটা একটু আলাদা।যা শুনলাম, এই ঘুরে বেড়ানো রীতিমত চর্চাই করে সে।

তার মানে, ঘাবড়ে গেছে রবিন।তাকে ঠেকানর কোন উপায়ই নেই মিস্টার অলিভারের?

না।তবে অলিভারের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।এসব ঘুরে বেড়ানো লোকেরা ক্ষতিকর নয়। ছায়া শরীর নিয়ে কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না এরা।শুধু দেখা বা শোনার ক্ষমতা থাকে তখন।

তুমি বলছ, কোন জিনিস ছুঁতে পারে না ওরা?

হয়ত ছুতে পারে, বললেন লিসা রোজার।তবে নড়াতে পারে না।মনট্রোজের মহিলার কথাই ধরা যাক, সাধারণ একটা খাম খুলতে পারেনি সে।

সুতরাং, ছায়া শরীরে ঘুরে বেড়ানর সময় কোন কিছু ধরতে, বা চুরি করতে পারবে না টমি গিলবার্ট?-

আমার তো মনে হয়, না।

টমি গিলবার্ট ভারতে যেতে চাইছে, খবরটা জানাল রবিন।ওখানে গিয়ে ধ্যানতত্ত্ব নিয়ে প্রচুর গবেষণা আর চর্চা করার ইচ্ছে।

মাথা ঝোঁকালেন প্রফেসর।শুনেছি, ভারতীয় ঋষিরা নাকি এসব বিদ্যায় ওস্তাদ।আমাদের দেশে অবশ্য.ওসব গালগল্প বিশ্বাস করে না লোকে।তবে, পুরো ব্যাপারটা একেবারে ভিত্তিহীন হয়ত নয়। সম্মোহন কিংবা ভেন্ট্রিলোকুইজম-এ তো বিশ্বাস করে লোকে। আজকাল ছায়া শরীর নিয়েও গবেষণা হচ্ছে, বিশ্বাস করতে

আরম্ভ করেছেন কিছু কিছু বিজ্ঞানী।

বুঝলাম, তুমিও বিশ্বাস কর, বলল রবিন।কিন্তু পাদ্রীর ভূতের ব্যাপারটা কি? ওটা বিশ্বাস কর?

কাঁধ ঝাঁকালেন লিসা রোজার।বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ পাইনি এখনও।যেখানেই ভূত আছে শুনেছি, ছুটে গিয়েছি।রাত কাটিয়েছি।কিন্তু আজ অবধি কোন ভূতের ছায়াও নজরে পড়েনি।এই বিশ্বাস কেন জন্মাল লোকের মনে, সেটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি, অনেক ভেবেছি।কোন কূল-কিনারা পাইনি।শেষে দুত্তোর বলে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্ভবত, ভূত বিশ্বাস করে আসছে লোকে।কেন? কে জানে!

.

১৫.

রবিন বেরিয়ে যাবার পর পরই সেন্ট্রাল হাসপাতালে ফোন করল কিশোর। জানল, জ্যাকবসকে হ্যামলিন ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।দিন দুয়েক তাকে পর্যবেক্ষণে

রাখতে চান ডাক্তাররা।লারিসা ল্যাটনিনা এখনও সেন্ট্রাল হাসপাতালে রয়েছে।প্রথমে তার সঙ্গে কথা বলা স্থির করল কিশোর।বেরিয়ে পড়ল।

সহজেই কেবিনটা খুঁজে বের করল কিশোর।খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে আছে লারিসা। বালিশে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে।বিষণ্ণ।

আরে! দরজায় সাড়া পেয়েই ফিরে তাকিয়েছে লারিসা।তুমি মিস্টার অলিভারের মেহমান না?

হ্যাঁ, বলল কিশোর।কিশোর পাশা।কেমন লাগছে এখন?

ভাল না খারাপও না, মুখ বাঁকাল লারিসা।তবে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল আমাকে কেউ, ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।তাছাড়া খিদে।জাউ আর দুধ ছাড়া কিছু খেতে দেয় না ডাক্তাররা, বিরক্ত ভঙ্গিতে পায়ের ওপর ফেলে রাখা কম্বলটায় লাথি লাগল সে।একটা উপদেশ দিচ্ছি, কক্ষণো বিষ খেও না!

চেষ্টা করব না খেতে! হাসল কিশোর।ভাল করে তাকাল লারিসার দিকে।স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে।ঠোঁটের কোণে কেমন এক ধরনের ঘা, সাদা সাদা।কি বিষ ছিল, জেনেছেন?

জিজ্ঞেস করেছিলাম, লারিসার কণ্ঠে বিরক্তি।সাধারণ কি একটা কেমিক্যালের কথা বলল ওরা, নামটা মনে করতে পারছি না এখন।তবে আর্সেনিক কিংবা স্ট্রিকনিন নয়, এটা শিওর।

বেঁচে গেছেন সেজন্যেই, মাথা দোলাল কিশোর।স্ট্রিকনিন খেলে আর এখন এখানে থাকতেন না।

জানি! এরপর থেকে চকলেট খাওয়াই বাদ দেব কিনা, ভাবছি, বিষণ্ণ হাসি হাসল লারিসা।

কোথা থেকে এসেছে ওগুলো, জানতে পেরেছে পুলিশ?

না।সাধারণ কেমিক্যাল, যে-কোন কেমিস্টের দোকান থেকে কেনা যায়।আর চকলেট তো একটা বাচ্চা ছেলেও কিনতে পারে।

সারা ঘরে নজর বোলাল কিশোর।ছোট একটা আলমারির ওপর রাখা ফুলদানীতে একগোছা ফুলের ওপর এসে থামল দৃষ্টি।কারও উপহার?

মাথা ঝোকাল লারিসা।এক বান্ধবী দিয়েছে।একই জায়গায় কাজ করি আমরা।রোজই এক গোছা করে দিয়ে যায়।কথা বলে যায় খানিকক্ষণ।

লোকের সঙ্গে মেশামেশি ভালই আছে আপনার, না?

হেসে ফেলল লারিসা।পুলিশের মত জেরা শুরু করে দিয়েছ।পুরো সকালটা আজ জ্বালিয়ে খেয়েছে।প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে।জানার চেষ্টা করেছে, আমার কোন শত্রুআছে কিনা। যত্তোসব! লোকের সাথেও নেই আমি, পাঁচেও নেই, আমার শত্রুথাকতে যাবে কেন?

আমারও তাই ধারণা, মাথা ঝোকাল কিশোর।হ্যাঁ, মিস্টার অলিভার আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।আবার তার বাড়িতে ফিরে গেলে তিনি খুশি হবেন।

খুব ভাল লোক, বলল লারিসা।আমি খুব পছন্দ করি।ভাল লোকের ওপরই যতরকম অত্যাচার।চোর-ছ্যাচোড়-বদমাশ–হ্যাঁ, ভাল কথা, কুকুরটা কি এসেছে তার?

স্থির হয়ে গেল হঠাৎ কিশোর।কুকুর!

হ্যাঁ।ওটা এলে চোরের উপদ্রব কমবে।

মিস্টার অলিভার বলেছেন?

না, মাথা নাড়ল লারিসা।মিসেস ডেনভার+কবে যেন বলল, কবে যেন–হ্যাঁ হ্যাঁ, গত শনিবারে।পুলে সাঁতার কাটছিলাম, কিনারে বসে ডাকপিয়নের অপেক্ষা করছিল মহিলা, আর বকর বকর করছিল।মিস্টার অলিভার কুকুর আনাচ্ছেন জেনে ম্যানেজারের খুব দুশ্চিন্তা।বলেছে আমাকে।আমি বললাম, রাজ্যের যত বেড়ালকে যখন সইতে পারছেন, একটা কুকুর সইতে পারবেন না কেন?

মাথা ঝোঁকাল কিশোর।হু!–আচ্ছা, বাসায় রয়ে গেছে, এমন কোন জিনিস দরকার আপনার? বললে দিয়ে যাব এক সময়।

না, দরকার নেই, মাথা নাড়ল লারিসা।যা যা লাগে, চাইলেই পাওয়া যায় এখানে।খালি পছন্দসই খাবার দিতে চায় না।এছাড়া সব রকমভাবে সাহায্য করে নার্সেরা।চুপ করল একটু।হয়ত, আগামীকালই ছেড়ে দেবে ওরা আমাকে।কাল নাহলে পশু তো ছাড়বেই।

লারিসাকে গুড বাই জানিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।মনে ভাবনা।যা সন্দেহ করেছিল, মিসেস ডেনভারের কল্যাণে ছায়াশ্বাপদের কথা অলিভারের বাড়ির আর কারও জানতে বাকি নেই।বাইরেরও কজন জানে, কে জানে! ডাকপিয়নসহ হয়ত পোস্ট অফিসেরও সবাই জানে।গির্জার ওরাও জানে নিশ্চয়।হয়ত পুরো পাড়াই খবরটা জেনে গেছে।তবে, লোকেরা জানে, জ্যান্ত কুকুর আনবেন অলিভার।

মূর্তিটার কথা কজন জানে? টমি গিলবার্ট? জ্যাকবস? জিজ্ঞেস করতে হবে স্টকব্রোকারকে।ওখানেই যাবে এখন কিশোর।হ্যামলিন ক্লিনিক কোথায়, চেনে না সে।ট্যাক্সি নেয়া স্থির করল।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে এল কিশোর।সারির সবচেয়ে আগের গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, হ্যামলিন ক্লিনিক কোথায়, চেনেন?

অবশ্যই।উইলশায়ার আর ইয়েলের মাঝামাঝি

যাবেন?

এস।

অবাক হয়ে দেখল কিশোর, প্যাসিও প্লেসের দিকে ছুটেছে ট্যাক্সি। আরে! মিস্টার অলিভারের বাড়িতে চলে যাবে নাকি? দূর, কি বোকামি করেছে! অলিভারকে জিজ্ঞেস করলেই হত।তার বাড়ির মাত্র দুটো ব্লক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি।ছোটখাট একটা আধুনিক বাড়ি।গেটের কপালে বড় করে লেখা: হ্যামলিন ক্লিনিক।

ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাসপাতালে ঢুকে পড়ল কিশোর।রিসেপশন রুমে ঢুকেই থমকে গেল।সেন্ট্রাল হাসপাতালের তুলনায় এটা রাজবাড়ি।প্রাইভেট ক্লিনিক, যারা প্রচুর পয়সা খরচ করতে পারে, তাদের জন্যে।পুরু কার্পেটে ঢাকা মেঝে।দামি আসবাবপত্র। ঝকঝকে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে হালকা।লাল পোশাক পরা স্মার্ট রিসেপশনিস্ট। কাছে এসে জ্যাকবসের রুম নাম্বার জানতে চাইল কিশোর।মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। একটা খাতা খুলে নাম মিলিয়ে কেবিন নাম্বার বলে দিল।

দোতলায় কোণের দিকে বেশ বড়সড় একটা ঘর।দুটো খোলা জানালা দিয়ে।রোদ ঢুকছে। বিছানায় শুয়ে আছে জ্যাকবস।লাল মুখ ফেকাসে সাদা হয়ে গেছে।বিছানার পায়ের কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসে আছে তার ভাগ্নে বব বারোজ।চোখমুখ কালো করে রেখেছে।

কিশোরকে দেখেই বলে উঠল জ্যাকবস, উপদেশ দিতে এসেছ তো? যেতে পার।অনেক হয়েছে।সারাটা দিন আমার কান ঝালাপালা করে ফেলেছে বব।

সব সময় বলেছি, আবারও বলছি, ঘোষণা করল বব। ওই সিগারেট তোমাকে খাবে! এবারে বেঁচ্ছে কোনমতে, এর পরের বার আর বাঁচবে না।

একশো বার বলছি, আমি ক্লান্ত ছিলাম, মুখ গোমড়া করে ফেলেছে। জ্যাকবস। ক্লান্ত ছিলাম, সেজন্যেই ঘটল এটা।জানিসই তো, খুব হুঁশিয়ার থাকি আমি।সিগারেট নিয়ে বেডরুমেও যাই না।

তাহলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাওয়ার জন্যে বুঝি সোফায় শুয়েছিলে?

গুঙিয়ে উঠল জ্যাকবস।উফ, আর পারি না! বাঁচাল ভাগ্নের চেয়ে খারাপ জীব আর কিছু নেই পৃথিবীতে!

তাই ঘটেছিল, না? মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল কিশোর।সিগারেট মুখে।নিয়ে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

তাই হয়ত হবে! স্বীকার করল জ্যাকবস।এছাড়া আর কি হতে পারে? মনে আছে, মিসেস ডেনভার অ্যাক্সিডেন্ট করার পর ঘরে ঢুকেছি...ভীষণ ঘুম পেয়েছিল–শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম সোফায় বসে-তারপর আর কিছু মনে নেই।শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। জেগে উঠে দেখলাম ধোয়ায় ভরে গেছে ঘর।চোখ জ্বালা করছে।ভাল দেখতে পাচ্ছি না। এর মাঝেই দরজাটা খুঁজে বের করতে গেলাম।তারপর তো বেহুশ!

ভুল দিকে দরজা খুঁজতে গিয়েছিলেন, বলল কিশোর।বেডরুমের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

মাথা ঝোঁকাল জ্যাকবস।তুমি বের করে এনেছ আমাকে।

আমি একা নই, জানাল কিশোর।রবিন, মুসা আর টমিও সঙ্গে ছিল।টমিকেই ধন্যবাদ দেয়া উচিত আপনার।আগুন লেগেছে, সে-ই দেখেছে প্রথমে।

অদ্ভুত একটা ছেলে! বিড়বিড় করল জ্যাকবস।দেখতে পারতাম না ওকে।অথচ ও-ই আমার জান বাঁচাল।

মিস্টার জ্যাকবস, বলল কিশোর।মিস্টার অলিভার একটা কুকুর আনাচ্ছেন, শুনেছেন আপনি?

কুকুর! বালিশ থেকে মাথা তুলে ফেলল জ্যাকবস।কুকুর দিয়ে কি করবে?

জানি না।শুনলাম, কুকুর আনবে শুনে মিসেস ডেনভার খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ওই মহিলা! ও-তো খামোকাই চিন্তিত হয়ে পড়ে।কতখানি সত্যি বলেছে তাই বা কে জানে! এত বেশিকথা বলে, মিথ্যে না বললে পাবে কোথায় কথা? আবার বালিশে মাথা রাখল জ্যাকবস।টান টান করল শরীরটা।ওই বাড়িতে আর থাকছি না আমি।কিশোরের দিকে তাকাল।তোমরাও চলে যাও ওখান থেকে।বাড়িটা মোটেই নিরাপদ না।

উঠে দুপা এগিয়ে এল বব।ওসব নিয়ে ভেব না এখন।ডাক্তার বলেছে, চুপচাপ বিশ্রাম নিতে।আমি যাচ্ছি, ঘরদোর পরিষ্কার করে ফেলিগে।কিছু মেরামতের থাকলে তা-ও করে ফেলব।আগে ভাল হয়ে ওঠো, তারপর খুঁজে পেতে।ভাল আরেকটা বাড়ি দেখে উঠে যাব।

হাসল জ্যাকবস।আসলে ছেলেটা তুই খারাপ না, বব।একেক সময় ভাবি, . আমি তোর গার্জেন, না তুই আমার!

যাচ্ছি, কিশোরের দিকে ফিরল বব।তুমি?

আমিও যাব।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এল দুজনে।

খুব বেশি বিড়ি খায় আমার মামা, তিক্ত কণ্ঠে বলল বব।খাটেও সাংঘাতিক, দুশ্চিন্তাও বেশি।আগুন লেগেছে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে।

ঝট করে চোখ ফেরাল কিশোর ববের দিকে।

না না, খারাপ অর্থে বলিনি, তাড়াতাড়ি বলল বব।হাসপাতালে একটু বিশ্রাম নিতে পারবে। ইদানীং খুব বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, ঘুমাতই না বলতে গেলে।বড় বেশি ভাবত। অযথাই চমকে চমকে উঠত।এটা লক্ষ করছি ক্রিসমাসের পর থেকে।ব্যবসা সুবিধের যাচ্ছে না কিছুদিন ধরে।সেটাই কারণ হতে পারে।তার ওপর অতিরিক্ত সিগারেট।শরীর তো খারাপ হবেই।এবার আর না ঘুমিয়ে পারবে না।ঘুমোতে না চাইলে ঘুমের বড়ি খাওয়াবে ডাক্তাররা।সিগারেট ছুতেও দেবে না।দিন দুয়েক বিশ্রাম হবে।

এবং সেটা ভালই হবে, রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর।ইদানীং ওই বাড়িটাতেও অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে! যে রাতে চোর এসেছিল, তুমি ও-বাড়িতে ছিলে না, না?

নাহ্...একটা মজা মিস করেছি।বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।মামার কাছে শুনলাম, চোর এসেছিল।

মিস্টার অলিভার যে কুকুর আনাচ্ছেন, এটা শুনেছ?

না।বুড়িটাকে সহ্যই করতে পারি না আমি, কথা বলতে এলে পালাই।নইলে হয়ত শুনতে পেতাম।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে এসে পৌঁছুল ওরা।চত্বর পেরিয়ে জ্যাকবসের ফ্ল্যাটের কাছে এল।

ভাঙা জানালার দিকে চেয়ে শিস দিয়ে উঠল বব।শার্সিতে ভাঙা কাঁচের কয়েকটা টুকরো লেগে আছে এখনও।পর্দার জায়গায় ঝুলছে কয়েক ফালি পোড়া ন্যাকড়া।

কাঁচের মিস্ত্রিকে খন্ত্র দিতে হবে আগে, পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল বব।একটা চাবি বেছে নিয়ে তালায় ঢোকাল।বাইরের অবস্থা দেখেই ভেতরে কি হয়েছে বুঝতে পারছি। এমন হবে জানলে কে যেত মামাকে একা ফেলে! মোচড় দিয়ে তালা খুলে ফেলল।দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে+ কিশোরও ঘুরে দাঁড়াল।ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে এগোল।মনে ভাবনা।

লারিসা ল্যাটনিনার বিষ খাওয়াটা কি নিছকই দুর্ঘটনা? জ্যাকবস কি সত্যিই জানে না। কুকুর আনার কথা? যতখানি নিরীহ আর নিরপরাধ মনে হচ্ছে বব বারোজকে, আসলেও কি তাই? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সন্দেহ পুরোপুরি গিয়ে পড়ে টমি গিলবার্টের ওপর। সে-ই একমাত্র লোক, যে জানতে পারে হাউণ্ডের মূর্তিটার কথা।আরও একটা যদি আছে এখানে-যদি সত্যিই মিস্টার অলিভারের ঘরের ছায়াটা সে-ই হয়।আরেকটা কথা মনে এল কিশোরের।কেউ একজন চাইছে, অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা আর তার আশপাশের এলাকা থেকে লোকজন সরিয়ে দিতে।তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এরপর কাকে সরানর পালা? নিশ্চয় তিন গোয়েন্দা!

১৬.

বেল বাজাল কিশোর।

দরজা খুলে দিল মিকো ইলিয়ট।এস।মাত্র ফিরেছে তোমার বন্ধু রবিন।কিছু একটা শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।তোমার অপেক্ষাই করছে।

একটা সোফায় বসে আছে রবিন।কোলের ওপর খোলা নোট বুক।

পুরানো ধাঁচের একটা চেয়ারে বসা মিস্টার অলিভার।কিশোরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, লারিসা কেমন আছে?

ভাল, জানাল কিশোর।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।জ্যাকবস? তাকে দেখতে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম।তেমন আহত মনে হল না।তবে বিশ্রাম দরকার।ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ডাক্তাররা পর্যবেক্ষণে রাখতে চাইছেন।

অ।

আপনার কোন অসুবিধে হয়নি তো?

না, মাথা নাড়লেন অলিভার।বসে না থেকে মিকোকে নিয়ে ব্যাংকে গিয়েছিলাম।টাকা তুলে নিয়ে এসেছি, ল্যাম্প রাখা টেবিলটা দেখালেন।মুদি দোকান থেকে জিনিসপত্র আনার একটা বাদামী ব্যাগ পড়ে আছে।টাকা কত তুলে এনেছি, কত জমা দিয়েছি।জীবনে এত অস্বস্তি বোধ করিনি আর কখনও!

বুদ্ধিটা ভালই বের করেছ, বলে উঠল মিকো।বাজারের ব্যাগে করে টাকা নিয়ে আসা।দশ হাজার ডলার! কেউ কল্পনাই করতে পারবে না।

ব্যাগের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হাসল কিশোর।হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি।

আবার বাজল বেল।উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল মিকো।

মুসা ঢুকল।ধপাস করে বসে পড়ল রবিনের পাশে।কোন লাভ হল না! হতাশ কণ্ঠ।মিথ্যে কথা বলেনি টমি।কাজেই গেছে।আর ব্রায়ান এনড্রুও মিছে কথা বলেনি।সে-ও মোটেলে উঠেছে।

লাভ হল না বলছ কেন? জেনে আসাতে সুবিধেই হয়েছে, মুসাকে আর কিছু- বলার সুযোগ না দিয়ে সামনে ঝুঁকল রবিন।সবাই এসে গেছ।এবার আমার কথা শুরু করি।

কি জেনে এসেছ? জিজ্ঞেস করল কিশোর।

একই সময়ে একই সঙ্গে দুজায়গায় থাকতে পারে কিছু কিছু মানুষ, কণ্ঠে রহস্য ঢালল রবিন।ধীরে ধীরে বলে গেল সব, যা যা জেনে এসেছে প্রফেসর লিসা রোজারের কাছ থেকে।

তার মানে, রবিন থামলে বলল কিশোর।টমি দেয়াল ভেদ করে যেখানে খুশি ঢুকতে পারে, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

লিসা খালা তো তাই বলল।

যাক! আজ নিশ্চিন্ত! জোরে শ্বাস ফেলল মুসা।ম্যানেজারকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে পারবে না ব্যাটা।কাজেই ছায়া হয়ে এ-ঘরে আসতে পারবে না।

উঠে গিয়ে ব্যাগটাসহ টাকাগুলো ছোট একটা আলমারিতে ভরে তালা দিয়ে দিলেন অলিভার।সতকর্তা।আশা করি, ছায়া মাথাটা এই আলমারিতে সেঁধিয়ে দিতে পারবে না হারামজাদা!-

যদি পারেও, ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পারবে না, কথার পিঠে বলল রবিন।ছায়া চোখ দিয়ে লোকে দেখতে পারে, কিন্তু ছায়া আঙুল দিয়ে কিছু নাড়তে পারে না।কাজেই ভয় নেই।

এজন্যেই, মিসেস ডেনভারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে নেবার পর আর কোন জিনিস নাড়াচাড়া হয়নি, বললেন অলিভার।ঘাটাঘাটি করত শুধু ওই বুড়িটাই।টমি ব্যাটা শুধু বাইরে যা আছে দেখতে পারে, দেখে চলে যায়।

হ্যাঁ, মাথা ঝোকাল কিশোর।এখন বোঝা যাচ্ছে, মান্দালাটার কথা জানল কি করে টমি। ছায়াশ্বাপদের কথাও সে জানে।আপনি মিস্টার ইলিয়টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, সে শুনেছিল।তবে, যেহেতু ছায়া শরীর কিছু ধরতে পারে।না, চোর টমি নয়।চুরিটা যখন হয়, তার ঘরে ঢুকছিল টমি।বারদুই নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে।বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ডক্টর ক্লোজারের কথা অবিশ্বাসও করা যায় না।তিনি বিজ্ঞানী।আলতু-ফালতু কথা বলেন না।তাছাড়া, ওই ছায়ার।ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর থিওরি পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না আর।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসা।দৃষ্টি রাস্তার দিকে।হঠাৎ বলল সে, জ্যাকবসের ভাগ্নে চলে যাচ্ছে।

তারমানে, এ বাড়িতে এখন আমরা ছাড়া আর কেউ নেই, যে আলমারিতে টাকা রেখেছেন অলিভার, সেটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।ব্যাগ ভর্তি টাকা! রহস্যময় শোনাল তার কণ্ঠ।যেহেতু ব্যাগের ভেতরে রয়েছে, টাকাগুলো অদৃশ্য! হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুই চোখ।কোন জিনিস আরেকটা জিনিসের ভেতরে থাকলেই অদৃশ্য!

কিশোর, কি বলছ, কিছু বুঝতে পারছি না! বলল রবিন।

একটা গল্প শোনাব?

কিশোর! গুঙিয়ে উঠল মুসা।ফিরে তাকিয়েছে।আর ভুগিও না! বলে ফেল!

খুনের গল্প, কারও দিকেই তাকাল না কিশোর। অনেকদিন আগে একটা বইয়ে পড়েছিলাম।অদৃশ্য একটা অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছিল লোকটাকে।

তাই? আগ্রহী হয়ে উঠেছেন অলিভার।

ঘরে বসে ডিনার খাচ্ছিল একটা লোক আর তার স্ত্রী, বলল কিশোর।তাদের সঙ্গে সেরাতে খেতে বসেছিল লোকটার এক বন্ধু।দরজা-জানালা সব বন্ধ ঘরের।কি একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হল লোকটা আর তার বন্ধুর মাঝে।হাতাহাতি শুরু হল এক পর্যায়ে।

হাতের নাড়া লেগে টেবিলে বসানো একমাত্র মেমিটা উল্টে পড়ে নিভে গেল।অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।অন্ধকারে স্বামীর আর্তনাদ শুনতে পেল স্ত্রী।টের পেল, তার জামার ঝুলে টান পড়েছে।আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল।মহিলা।চিৎকার শুনে ছুটোছুটি করে এল চাকর-বাকরেরা। আবার আলো জ্বালানো হল।দেখা গেল, মেঝেতে মরে পড়ে আছে লোকটা।রক্তাক্ত। বুকের বাঁ পাশে একটা ক্ষত।ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে বন্ধুটি।মহিলার জামার নিচের দিকে রক্তের দাগ।পুলিশ এল।কিন্তু বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েও আবার ছেড়ে দিতে হল। কারণ, যে অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে লোকটাকে, সেটা পাওয়া গেল না।

আশ্চর্য! বলে উঠল মিকো।কি দিয়ে খুন করা হয়েছিল?

হাসল কিলোর।ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না লোকটার স্ত্রী।তাঁদড় এক গোয়েন্দার কাছে গিয়ে ধর্না দিল।পাওয়া গেল অস্ত্রটা।আবার বন্ধুকে অ্যারেস্ট করল পুলিশ।ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুনের দায়ে ঝুলিয়ে দিল ফাঁসিতে।খুন করা হয়েছিল ছুরি দিয়ে।

ছুরি! চেঁচিয়ে উঠল মিকো।কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল?

বড় একটা কাঁচের ফানেলে পানি ভরে তাতে মানিপ্ল্যান্ট লাগিয়েছিল খুন হওয়া লোকটার স্ত্রী।খুন করেই মহিলার জামায় ছুরির রক্ত মুছে ফেলল বন্ধুটা।ছুরিটা নিয়ে ঢুকিয়ে রাখল ফানেলে।

ওটা তো প্রথমেই পুলিশের চোখে পড়ে যাবার কথা! হাঁ হয়ে গেছে মুসা।

না, কথা না।কারণ ছুরিটা তৈরি হয়েছিল শক্ত ক্রিস্টাল দিয়ে।পানিভর্তি কাঁচের ফানেলে ঢুকিয়ে রাখতেই অদৃশ্য হয়ে গেল।পানি আর কাঁচের সঙ্গে মিশে গেল স্বচ্ছ জিনিসটা। অলিভারের দিকে তাকাল সে হঠাৎ।মিস্টার অলিভার, কেন বিষ খাওয়ানো হল মিস ল্যাটনিনাকে? কারণ, রোজ রাতে নিয়মিত সাঁতার কটিতে।নামত সে সুইমিং পুলে।

ঈশ্বর! চেঁচিয়ে উঠল মিকো।

এবং মিসেস ডেনভার, বলে গেল কিশোর, যতই ছোঁক ছোঁক করুক, আগে তো কেউ কোন ক্ষতি করেনি তার।তার গাড়িতে বোমা মারা হল কবে? পুলের পানি পরিষ্কার করবে, বলার পর।মিস্টার অলিভার, আমরা ক্রিস্টালে তৈরি একটা মূর্তি খুঁজছি।যেটা ওই ছুরির মত জিনিস দিয়েই তৈরি।যেটা পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পুল! চেঁচিয়ে উঠল রবিন।পুলের পানিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মূর্তিটা!

কোমরে হাত রেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল কিশোর।আগামীকাল দশ হাজার ডলার দিয়ে মূর্তিটা কিনতে হবে, মিস্টার অলিভার।কেন? আজই যদি পুল থেকে তুলে নিয়ে আসি ওটা? এখনই উপযুক্ত সময়।বাইরের কেউ নেই এখন বাড়িতে।

ঠিক! ঠিক বলেছ! উত্তেজনায় কাঁপছেন অলিভার।

হাসল কিশোর।রবিন, পেছনের গেটে গিয়ে দাঁড়াও তুমি।কেউ আসে কিনা দেখবে।মুসা, সামনের গেটে তুমি থাকবে।রাস্তার দিকে নজর রাখবে।

তুমি? জানতে চাইল মুসা।

সাঁতার কাটতে যাব, শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করেছে কিশোর।

রবিন আর মুসা গিয়ে দাঁড়াল দুই গেটে।কিশোরকে অনুসরণ করে পুলের কিনারে এসে দাঁড়ালেন অলিভার আর মিকো।

খালি গা।ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল কিশোর।একটু দ্বিধা করে নেমে পড়ল সে পানিতে।গলা পানিতে এসে ডুব দিল।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন অলিভার আর মিকো।এত দেরি করছে।কেন কিশোর! আসলে তিরিশ সেকেণ্ডও যায়নি, এটা খেয়াল করছে না তারা।

ভুসস করে ভেসে উঠল কিশোর।ডান হাতটা তুলল পানির ওপর।হাতে কিছু।একটা ধা।

পেয়েছে।পেয়েছে! প্রায় নাচতে শুরু করলেন অলিভার।

চুপ! আস্তে! থামিয়ে দিল তাঁকে মিকো।

পুলের কিনারে চলে এল কিশোর।জিনিসটা বাড়িয়ে দিল অলিভারের দিকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে নিলেন অলিভার।অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম।নিখুঁত সৃষ্টি।পেশীগুলো পরিষ্কার, প্রায় চৌকোনা ভোতা মাথাটাকে জ্যান্তই মনে হচ্ছে।বড় বড় চোখ দুটো সোনালি, দুই কশে সোনালি ফেনা।সামনের পায়ের নিচ থেকে কানের ডগার উচ্চতা ছয় ইঞ্চি।সামনের দুই পায়ের ফাঁকে ক্রিস্টালে তৈরি মানুষের খুলির একটা খুদে প্রতিকৃতি আঁকড়ে ধরে রেখেছে।কুকুরটার কোমরে মোটা লম্বা সুতো বাধা।স্বচ্ছ, প্লাস্টিকের সুতো।

এত সহজ! বলল কিশোর।পানিতে নামারও দরকার হয়নি চোরের।সুতোয় ধরে আস্তে করে পানিতে ছেড়ে দিয়েছে মূর্তিটা, ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে গভীর পানিতে চলে গেছে ওটা।হাত থেকে সুতো ছেড়ে দিয়েছে চোর।স্বচ্ছ সুতো, পানির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।কুকুরটার চোখ আর কশের ফেনা সোনালি, তলার সোনালি মোজাইকের সঙ্গে মিলে গেছে।

বুদ্ধি আছে চোর-ব্যাটার! স্বীকার করল মিকো।

দিন ওটা।অলিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর।

দেব!

হ্যাঁ।আবার পুলের তলায় রেখে দেব।

কেন!

কারণ, আজ রাতে এটা নিতে আসবে চোর।টেলিভিশন মনিটর অন করে দেব।ঘরে বসেই দেখতে পাব চোরকে।

বুঝেছি, মূর্তিটা ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করছেন অলিভার।

দিয়ে দাও, ফ্র্যাঙ্ক, বলল মিকো।

কিন্তু-কিন্তু মূর্তিটার ক্ষতি হতে পারে!-ভেঙেটেঙে ফেলতে পারে–

ভাঙবে না।ও ব্যাপারে হুশিয়ার থাকবে চোর।ভাঙা মূর্তি বিকোবে না।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে মূর্তিটা আবার কিশোরের হাতে তুলে দিলেন অলিভার।

ডুব দিয়ে আবার আগের জায়গায় জিনিসটা রেখে এল কিশোর।ঠাণ্ডায়।কাঁপতে কাঁপতে পানি থেকে উঠে এল।একটা তোয়ালে আর কিছু ন্যাকড়া দরকার।পুলের ধারে এত পানি দেখলে সন্দেহ করে বসবে চোর।পানিতে নেমেছি, অনুমান করে ফেলবে।তাছাড়া চত্বরে ভেজা ছাপ থাকাও উচিত না।

প্রায় ছুটে চলে গেল মিকো।মিনিটখানেক পরেই অলিভারের ঘর থেকে একটা তোয়ালে আর কিছু ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এল।তোয়ালেটা কিশোরের হাতে তুলে দিয়ে নিজে পুলের কিনারে ঝরে পড়া পানি পরিষ্কার করতে লেগে গেল।

দ্রুতহাতে গা মুছতে লাগল কিশোর।

সামনের গেট থেকে ছুটে এল মুসা।এনড্রু আসছে!

রবিনকে ডাকো! মিকোর দিকে চেয়ে বলল কিশোর, আপনারা দুজন ওপরে চলে যান! তাড়াতাড়ি ভেজা পায়ের তলা মুছে ফেলতে লাগল সে।

সবার শেষে অলিভারের বসার ঘরে ঢুকল কিশোর।অন্য চারজন আগেই ঢুকে পড়েছে। দরজা বন্ধ করে দিল মিকো।টেলিভিশনের সুইচ অন করল কিশোর।

গেটে দেখা দিল বেড়াল-মানব।চত্বর দিয়ে হেঁটে চলল নিজের ফ্ল্যাটের দিকে।

পুলের দিকে তাকালও না! বিড়বিড় করল কিশোর।ভেজা প্যান্ট খুলে ফেলে তোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে।

কেন? রবিন শুকনো একটা শার্ট এনে দিল বন্ধুকে।তাকাল না কেন?

মনে হয় গেট থেকেই খেয়াল করেছে, পুলের পানিতে ঢেউ।বোঝাই যায়, কেউ নেমেছিল। কিনারের পানিও পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়নি।

ও চোর নয় তাহলে! বলল মুসা।

হয় চোর নয়, কিংবা সন্দেহ করে ফেলেছে, পুলে নেমেছিল কেউ।মূর্তিটা পাওয়া গেছে। আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে তার ওপর।তা যদি হয়ে থাকে, অসম্ভব ধূর্ত সে!–দেখা যাক, কি হয়!

একটা দুটো করে বেড়াল ঢুকতে শুরু করল চত্বরে।এনড্রুর ঘরের বারান্দায় জমায়েত হল কয়েক ডজন।অর্ধচন্দ্রকারে বসে পড়ল।একগাদা প্লেট হাতে বেরিয়ে এল এনড্রু।একটা করে প্লেট রাখল প্রতিটা বেড়ালের সামনে।আবার ঘরে ঢুকল।বড় একটা পাত্রে করে খাবার নিয়ে বেরোল।প্লেট ভরে খাবার দিল।বেড়ালগুলোকে।

জানোয়ারগুলো খাচ্ছে, আর সামনে বসে দেখছে এনড্রু।কথা বলছে ওগুলোর সঙ্গে।আশ্চর্য শৃঙ্খলা! একে অন্যের সঙ্গে মারামারি করল না বেড়ালগুলো, কামড়াকামড়ি খামচাখামচি কিছুই করল না।শান্তভাবে যার যার প্লেটের খাবার শেষ করে চলে গেল একে একে।

প্লেটগুলো নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে গেল এনড্রু।খানিক পরেই দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে চলে গেল সে-ও।

টেলিভিশনের পর্দায় একনাগাড়ে চোখ রাখল তিন গোয়েন্দা।এগারোটার সময় যথারীতি আলো নিবে গেল।বেড়াল-মানবের পর আর কেউ ঢোকেনি চত্বরে।বসার ঘরে বসেই ডিনার খেয়ে নিয়েছে ওরা তিনজনে।

জ্যাকেট তুলে নিল মুসা সোফার ওপর থেকে।গায়ে চড়াল।ব্যালকনিতে যাচ্ছি।লুকিয়ে থেকে চোখ রাখব।

আমিও আসছি, উঠে দাঁড়াল কিলোর।টেলিভিশনের সুইচ অফ করে দিল।

আমিও, রবিনও উঠল।আজ রাতে কিছু একটা ঘটবেই।মিস করতে চাই না।বঞ্চিত করতে চাই না চোখকে।

.

১৭.

মাঝরাতে গেট খোলার শব্দ হল।চত্বরে ঢুকল টমি গিলবার্ট।ঘরে চলে গেল।কয়েক মিনিট আলো দেখা গেল তার জানালায়, তারপর নিবে গেল।

ব্যালকনিতে অপেক্ষা করে আছে তিন গোয়েন্দা।

একটা দরজা খুলল, বন্ধ হল, শোনা গেল মৃদু আওয়াজ।

পুলের ওপাশে একটা ছায়া দেখা গেল।কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা।

ধীরে ধীরে পুলের ধারে এসে দাঁড়াল ছায়াটা। আস্তে করে নেমে পড়ল পানিতে। ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়েছে পানিতে এক জায়গায়, দেখা গেল ছোট ছোট ঢেউ, সাতরে এগোচ্ছে ছায়াটা।

পুলের ঠিক মাঝখানে দেখা গেল একটা মাথা, আবছা! পরক্ষণেই ডুবে গেল।পানির নিচে দেখা গেল আলোর রশ্মি।পানি-নিরোধক টর্চ।নড়াচড়া করছে রশ্মিটা।

হঠাৎ নিবে গেল আলো।পানির ওপরে প্রায় নিঃশব্দে ভেসে উঠল আবার মাথাটা।

যেখান দিয়ে নেমেছিল, সেখান দিয়েই আবার উঠে পড়ল ছায়াটা।ফিরে চলল।মৃদু শব্দ হল দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার।

আস্তে করে দরজায় টোকা দিল মুসা।প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা।টমি! ফিসফিস করে বলল সে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল তিন গোয়েন্দা।পেছনে মিস্টার অলিভার আর মিকো ইলিয়ট।

অন্ধকারই রয়েছে টমির জানালা।

ছায়া শরীরে বেরিয়েছিল হয়ত! ফিসফিস করল মুসা।

মোটেই না! সবার আগে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর।বেল বাজাল।এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার বাজাল।গিলবার্ট! ডাকল চেঁচিয়ে।গিলবার্ট, দরজা খুলুন! নইলে পুলিশ ডাকব।ওরা দরজা ভেঙে ঢুকবে।

দরজা খুলে গেল।ঘুমোনর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে টমি।খালি পা, আবছা দেখা যাচ্ছে। কি হয়েছে? মাঝরাতে ডাকাডাকি কেন? ঘুমিয়েছিলাম...।

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দিয়েছে কিশোর।আলো জ্বলে উঠল।ঘাড়ের ওপর।লেপটে আছে টমির ভেজা চুল।

ঘুমোননি, শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।পুলে নেমেছিলেন।

না-আ! আমি– থেমে গেল টমি।চুল বেয়ে টপ করে পানি পড়েছে এক ফোঁটা।আমি শাওয়ারে গোসল করছিলাম।

আগে বললেন ঘুমিয়েছিলেন, এখন শওয়ার।দুটোই মিথ্যে কথা, শুধরে দিল কিশোর। আসলে পুলে নেমেছিলেন।পুলের ধার থেকে আপনার দরজা পর্যন্ত এসেছে ভেজা পায়ের ছাপ।

দরজার বাইরে তাকাল টমি।সত্যিই, দরজায় ভেজা ছাপ।কাঁধ ঝাঁকাল সে।বেশ, নেমেছিলাম পুলে।তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? সারাদিন।পরিশ্রম করেছি, সাঁতার কেটে শান্ত করে নিয়েছি শরীরটাকে।

হাউণ্ডটা কোথায়? প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন অলিভার।বজ্জাত! চোর!

কি যা-তা বলছেন! কিছুই বুঝতে না পারার ভান।কিন্তু সামাল দিতে পারল না টমি। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চোখ, ঝট করে ঘুরে গেছে রান্নাঘরের দিকে।

কোন একটা তাকে রেখেছেন নিশ্চয়, রান্নাঘরের দরজার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।খুব বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।লুকোনর সময় পাননি।

মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! বিড়বিড় করল টমি।

মিস্টার অলিভার, বলল কিশোর।পুলিশই ডাকুন।সঙ্গে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে বলবেন।

জোর করে কারও বাড়ি সার্চ করার নিয়ম নেই! বলল টমি।তাছাড়া মাঝরাতে ওয়ারেন্ট জোগাড় করতে পারবে না পুলিশ!

সেটা তাদের ব্যাপার, শান্ত কিশোর।না পারলে সকালতক অপেক্ষা করব।ইতিমধ্যে চত্বর থেকে নড়ছি না।আপনার ফ্ল্যাট ঘিরে রাখব আমরা।আমাদের চোখ এড়িয়ে বেরোতে পারবেন না, মূর্তিটা কোথাও ফেলেও দিয়ে আসতে পারবেন না।

তোমরা তোমরা তা করতে পার না! চেঁচাতে শুরু করেছে টমি।আমাকে, আমাকে অপমান করা হচ্ছে।

অপমান করলাম কোথায়? হাত নাড়ল কিশোর।চত্বরে বসে থাকব আমরা, আপনার দরজার দিকে চেয়ে থাকব, এতে কোন দোষ ধরতে পারবে না উকিল।কেন অযথা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন? মূর্তিটা দিয়ে দিন, আমরা সব ভুলে যাব।পুলিশ ডাকার দরকারই হবে না।

ঝাড়া কয়েক সেকেণ্ড কিশোরের দিকে চেয়ে রইল টমি।পিছিয়ে গেল দরজার কাছ থেকে।চুলোর ভেতরে রেখেছি।মুখ কালো হয়ে গেছে তার।খামোকা।এসব করতে গেলেন, মিস্টার অলিভার।মুর্তিটা আপনাকেই দিয়ে দিতাম।

ব্যঙ্গ করে হাসলেন অলিভার।তাই নাকি? নিশ্চয় দশ হাজার দেবার পর?

দশ হাজার! সত্যিই বিস্মিত হয়েছে টমি।কিসের দশ হাজার?

জানেন না? জিজ্ঞেস করল কিশোর।সত্যিই জানেন না টাকাটার কথা?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল টমি।ভেবেছিলাম, মূর্তিটা মিস্টার অলিভারকে দিলে কিছু পুরস্কার পাব।কিন্তু দশ হাজার ডলার, জানতাম না!

টমির পাশ কাটিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন অলিভার।প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন আবার।হাতে হাউণ্ডের মূর্তি।কোমরে বাঁধা সুতো মূর্তির শরীরে পেঁচানো।

মিস্টার অলিভার, বলে উঠল কিশোর।টমি চোর নয়।ঘুমের ভেতরে তার ছায়া শরীর শুধু ঘুরে বেড়ায়, দেখে, শোনে।তার বেশি কিছু করতে পারে না।

চমকে উঠল টমি।ফেকাসে হয়ে গেল চেহারা।উঠল-নামল কণ্ঠা, ঢোক গিলেছে।

কি দেখেছিলেন, গিলবার্ট? প্রশ্ন করল কিশোর। ঘুমের ঘোরে মূর্তিটার ব্যাপারে কি দেখেছিলেন? কি শুনেছিলেন?

কাঁপছে টমি।ইচ্ছে করে দেখিনি, শুনিওনি! ছায়া শরীর ঘুরে বেড়ায়, এতে আমার কোন দোষ নেই! ওটা এক ধরনের স্বপ্ন!

কি দেখেছেন স্বপ্নে? আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

একটা কুকুর, কাঁচের।দেখলাম, অনেক রাতে, অন্ধকারে পুলের ধারে এসে বসল একটা মানুষ।পানিতে নামিয়ে রাখছে কাঁচের কুকুরটা।মুখ ঢেকে রেখেছিল মানুষটা, চিনতে পারিনি।

আমার মনে হয়, সঙ্গীদের দিকে ফিরল কিশোর, টমি গিলবার্ট সত্যি কথাই বলছেন।

.

১৮.

রক্ত ফিরে আসছে টমির মুখে।দেখ, কিশোর, মূর্তিটা আমি পুল থেকে তুলে এনেছি ঠিকই। কিন্তু সত্যি বলছি, ওটা সকালেই দিয়ে দিতাম মিস্টার অলিভারকে।আমি ওটা চুরি করিনি।

বুঝতে পারছি, বলল কিশোর, আপনি করেননি।চুরিটা যখন হয়, আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন। তবে, মূর্তিটা তুলে সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার অলিভারের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। লুকিয়ে রাখলেন কেন? কাজটা অন্যায় করেছেন।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মিকো।যাও, জলদি কাপড় বদলে এস, টমি।অলিভারের ঘরে থাকবে।তোমাকে চোখে চোখে রাখতে পারব।

জ্বলন্ত চোখে মিকোর দিকে তাকাল টমি।আপনি আমাকে আদেশ করার।কে? চেঁচিয়ে উঠল।বাড়িটা কি আপনার?

একই কথা তোমার বেলায়ও খাটে, বলে উঠলেন অলিভার।ছায়া শরীরেই হোক আর তরল শরীরেই হোক, তুমি আমার ঘরে ঢোকো কার হুকুমে? মিকো যা বলছে কর, নইলে জেলের ভাত খাওয়াব, চুরি করে অন্যের ঘরে ঢোকার অপরাধে।চোরাই মাল লুকিয়ে রাখার অপরাধে।

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল টমি।গটমট করে হেঁটে গিয়ে ঢুকল শোবার ঘরে।টান দিয়ে খুলল আলমারির পাল্লা।কয়েক মুহূর্ত পরে বন্ধ করে দিল ধাক্কা দিয়ে।মিনিট কয়েক পরেই ফিরে এল সে।গায়ে কালো সোয়েটার, পরনে হালকা রঙের প্যান্ট।

রাতটা আমার বসার ঘরে কাটবে, এবং ঘুমোতে পারবে না! কড়া আদেশ জারি করলেন অলিভার।

গোমড়ামুখে মাথা ঝোঁকাল টমি।

মূর্তিটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিলেন অলিভার।কিশোর, তুমি বলেছিলে, আজ রাতে চোরটাকে ধরবে!

ধরতে তো চাই।তবে চেঁচামেচি করে ভাগিয়ে দিলাম কিনা, কে জানে! এখনও সময় আছে অবশ্য।আবার ফিরে আসতে পারে সে।

নীরবে মূর্তিটা কিশোরের হাতে তুলে দিলেন অলিভার।মিকো আর টমিকে নিয়ে রওনা হলেন তাঁর ঘরে।

আবার আস্তে করে পুলের পানিতে মূর্তিটা ছেড়ে দিল কিশোর।দুই সঙ্গীকে নিয়ে বসল ব্যালকনিতে।ঠাণ্ডা, অন্ধকার দীর্ঘ মুহূর্তগুলো পেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।পুব আকাশে ধলপহর দেখা দিল।ধীর পায়ে এগিয়ে এল শীতের কুয়াশামাখা ধূসর ভোর।চোর আর এল না সে রাতে।

আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল, লাল চোখ ডলছে কিশোর।চোরটার আসার কোন দরকারই নেই।আগে টাকাটা নিয়ে নেবে মিস্টার অলিভারের কাছ থেকে, তারপর জানিয়ে দেবে কোথায় রেখেছে হাউণ্ডের মূর্তি।খুব সহজ।কেন খামোকা নিজে ওটা তুলে নিতে আসার ঝুঁকি নেবে?

পেছনে খুলে গেল দরজা।দাঁড়িয়ে আছেন অলিভার।নাশতা? ফিটফাট পোশাক পরনে, বেশ তাজা দেখাচ্ছে তাকে।

সবাই খেতে বসল, টমি গিলবার্ট ছাড়া। কাজের ঘরে একটা চেয়ারে বসে আছে গোমড়ামুখে।কিছু খেতে কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না সে।

নাশতা শেষ করেই কাজে লেগে গেল কিশোর।পুরানো একগাদা খবরের কাগজ আর কাচি নিয়ে বসল।কেটে কেটে একের পর এক আয়তক্ষেত্র বানাচ্ছে।প্রতিটি ক্ষেত্র দুই ইঞ্চি চওড়া, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা।

কি করছ? আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল রবিন।

শিগগিরই চোরটা জানাবে, কখন টাকা দিতে হবে তাকে।ওর জন্যে টাকার তোড়া তৈরি করে রাখছি, হাসল কিশোর।কুকুরটা কোথায়, জানেন এখন মিস্টার অলিভার।কাজেই সত্যি সত্যি টাকা দেবার কোন দরকারই নেই আর।

তাহলে ওই কাগজের তোড়া দেবারই দরকার কি? জানতে চাইল মুসা।

চোরটা কে জানার জন্যে, বলল কিশোর।তোড়াগুলোতে ম্যাজিক অয়েন্টমেন্ট মাখিয়ে দেব।ব্যাগটা ফেলে দিয়ে এলেই হল।তোড়ায় হাত দেবে

কালো দাগ পড়ে যাবে হাতে।তারপর চেপে ধরব ওকে।

এমনভাবে বলছ, যেন লোকটা আমাদের পরিচিত, বললেন অলিভার।

অবশ্যই পরিচিত, কিশোরের গলায় খুশির আমেজ।ও জানে, লারিসা ল্যাটনিনা চকলেটের পাগল।জানে, মিসেস ডেনভার ভোর চারটেয় বাজার করতে যায়।নিশ্চয় চোর এ-বাড়ির ভাড়াটে।

ব্রায়ান এনড্রু! চেঁচিয়ে উঠল মুসা।এ ছাড়া আর কেউ না!

হাসিল শুধু কিশোর, কিছু বলল না।

তুমি জান, সে কে? জিজ্ঞেস করলেন অলিভার।

জানি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না, বলল কিশোর।টাকাটা নিতে এলে প্যাকেটটা ধরলে, তখন আর অসুবিধে হবে না।

নীরবে কাজ করে চলল কিলোর।

ডাকপিয়ন এল বেলা দশটায়।ততক্ষণে দশটা তোড়া বানিয়ে ফেলেছে।কিশোর।সাজিয়ে রেখেছে বসার ঘরের টেবিলে।

ডাকবাক্সে একটা মাত্র চিঠি ফেলে গেল পিয়ন।

খামটা নিয়ে এল কিশোর।ওপরে টাইপ করে লেখা অলিভারের ঠিকানা।তার দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান।মাথা কাত করলেন অলিভার।

খামটা ছিঁড়ে ফেলল কিশোর।ভেতর থেকে বেরোল একটা ভাজ করা কাগজ।তাতে টাইপ করে ইংরেজিতে লেখা বাদামী কাগজে মুড়ে টাকাগুলো পার্কের কোণের ডাস্টবিনে ফেলে রেখে আসতে হবে আজ বিকেল ঠিক পাঁচটায়।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখল কিশোর।উইলশায়ার ডাকঘরের ছাপ।গতকালের তারিখ।গুড, হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। অয়েন্টমেন্ট মাখাতে শুরু করল কাগজের তোড়ায়। সবকটা তোড়াতে ভালমত মাখাল।তারপর বাদামী একটা বড় কাগজ পেচিয়ে সুন্দর করে প্যাকেট করল।বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই, ভেতরে টাকা আছে, না শুধু খবরের কাগজ কাটা।

ব্যস, হয়ে গেল, অলিভারের দিকে তাকাল কিশোর।বিকেল পাঁচটায় গিয়ে ডাস্টবিনে প্যাকেটটা রেখে আসবেন।দস্তানা পরে নেবেন।প্যাকেটের ওপরেও মলম মাখিয়েছি। আগে পুলিশে একটা ফোন করে নেবেন।হয়ত প্যাকেটটা তুলে নেবার সময়ই চোরকে ধরতে পারবে ওরা।

যদি অন্য কেউ তুলে নেয় প্যাকেটটা? বললেন অলিভার। সুন্দর প্যাকেট। কোন ছেলেছোকরার চোখে পড়লে তুলে নিতেও পারে।

তা পারে।তবে সেটা হতে দেবে না চোর।নিশ্চয় আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। আপনি ফেলে দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এসে তুলে নেবে।

আমরা কি যাব? জানতে চাইল মুসা।

হ্যাঁ। পাঁচটায় আমরাও গিয়ে লুকিয়ে থাকব, চোখ রাখব ডাস্টবিনটার ওপর। মিস্টার অলিভার, আপনি আমাদেরকে দেখার চেষ্টা করবেন না।কোনদিকেই তাকাবেন না।সোজা গিয়ে প্যাকেটটা ফেলে রেখে চলে আসবেন।

.

১৯.

বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

রেকটরির পাশের ছোট্ট ফুলের ঝোপে লুকিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা।রাস্তার ধারের ছোট পাকটা নির্জন।শুধু একজন ঝাড়দার রয়েছে।একটা ঝুড়ি আর ঝাড় হাতে নিয়ে পার্কের ময়লা পরিষ্কার করছে।চকলেটের মোড়ক, বিস্কুটের বাক্স, ছেঁড়া কাগজের টুকরো-টাকরা ইত্যাদি তুলে নিয়ে রাখছে ঝুড়িতে।ভরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে।

উইলশায়ারের দিক থেকে আসবে চোর, ফিসফিস করে বলল কিশোর।

একটা খবরের কাগজের ভ্যান এসে থামল পার্কের গেটের সামনে।পেছন।থেকে লাফিয়ে নামল, একজন হকার, বগলে একগাদা কাগজ। পথের পাশের ফুটপাতে কাগজগুলো সাজিয়ে রাখতে শুরু করল।চলে গেল ভ্যানটা।খদ্দেরের অপেক্ষা করছে হকার।পরিচিত দৃশ্য।

ছেলেদের মাথার ওপরে নিঃশব্দে খুলে গেল একটা জানালা।মনে হয়, শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ, তোমরা আমার ঘরে এসে বসলেই বেশি আরাম পাবে।বাইরে ঠাণ্ডা।

মুখ তুলে তাকাল মুসা।খোলা জানালায় মুখ বাড়িয়ে আছে ফাদার স্মিথ।দাঁতের ফাঁকে পাইপ।ওই ঝোঁপের ভেতরে কেন? ঘরে এস।সামনের দরজা খুলে দিচ্ছি।ঘুরে চল এস।

অনুভব করল কিশোর, ঝাঝা করছে কান।

এত ছোট ঝোপে লুকোনো যায় না, আবার বললেন ফাদার।দেখে ফেলবেই।চলে এস। আবার পুলিশের কাজে নাক গলাচ্ছ, দেখলে খেপে যাবে ওরা।

আর কি করবে? উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।রেকটরির পাশ ঘুরে এসে দাঁড়াল।সদর দরজার সামনে।খুলে গেল দরজা।ভেতরে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

তোমাদেরকে আসতে দেখেছি, বললেন ফাদার।ওই যে দুজন লোক, একজন ঝাড়দার, আরেকজন হকার, কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।ব্যাপারটা কি? গির্জায় চোর ঢোকার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?

ওরা দুজন কারও অপেক্ষা করছে, কি করে জানলেন? পাল্টা প্রশ্ন করল।কিশোর।আমরা তো বুঝতে পারিনি!

একজনকে চিনি আমি, হাসলেন ফাদার।ছদ্মবেশ নিয়েও ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে। সার্জেন্ট হোন।হাসপাতালে পলকে জেরা করতে গিয়েছিল।ওখানেই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার।অন্য লোকটাকে চিনি না।তবে হকার সে নয়, বাজি রেখে বলতে পারি।

ধর্মপ্রচারে না এসে ডিটেকটিভ হওয়া উচিত ছিল আপনার, ফাদার! বলে উঠল রবিন। পল কেমন আছে?

ভালই।চোর ওকে মেরেছে, এতে দুঃখ পাওয়ার চেয়ে খুশিই হয়েছে সে বেশি।খবরের কাগজে নাম উঠেছে তার।বোকা গাধা!দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরালেন ফাদার।বোকা মেয়ে মানুষটাও নেই আজ, বিকেলটা ছুটি।কোথায় জানি গেছে।এখানে, এই পার্লারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে পারছি সেজন্যেই।নইলে এতক্ষণে চেঁচিয়ে আমার মাথা খারাপ করে দিত।

হেসে ফেলল কিশোর।হাত ঘড়ির দিকে তাকাল।পাঁচটা বাজে প্রায়!

ঘোষণা করল সে।

মিস্টার অলিভারকে আসতে দেখা গেল, তাতে বাদামী কাগজের প্যাকেট।পার্কে যাওয়ার রাস্তাটার মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।কোণের দিকে একটা ডাস্টবিন, উপচে পড়ছে, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।এগিয়ে গিয়ে ওটার সামনে দাঁড়ালেন অলিভার।এদিক-ওদিক তাকালেন, তারপর কয়েকটা বাক্সের ওপর আস্তে করে রেখে দিলেন প্যাকেটটা।আর কোনদিকে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে ফিরে আসতে লাগলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উইলশায়ারের রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো লোকটা হাঁটতে শুরু করল।ভবঘুরে। ছেঁড়া ময়লা কোট, নিচে শার্ট নেই।প্যান্টের এক পায়ের নিচের দিকে ঝুল প্রায় আধ হাত নেই, ছিঁড়ে পড়ে গেছে কোন্ কালে।

আহা! আস্তে মাথা নাড়লেন ফাদার।বেচারা!

পার্কের গেটের দিকে এগোচ্ছে ভবঘুরে।তার কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে রয়েছে ঝাড়দার। নুয়ে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা কি যেন তুলছে।কাগজ গুনছে হকার।

ডাস্টবিনের কাছে এসে দাঁড়াল ভবঘুরে।ডাস্টবিন ঘাঁটতে শুরু করল।পরিত্যক্ত খাবার খুঁজছে যেন।কয়েক মুহূর্ত পরেই সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।হাতে বাদামী প্যাকেট।চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা তার কোটের ভেতরে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হকার।ছুটল ভবঘুরের দিকে।

হাত থেকে ঝাড়-ঝুড়ি ফেলে দিয়ে ছুটল সার্জেন্ট হেগান।

দুটো লোককে প্রায় একই সঙ্গে ছুটে আসতে দেখল ভবঘুরে।ঘুরেই সে ছুটল উল্টো দিকে। জানালার চৌকাঠে উঠে গেল মুসা।লাফিয়ে পড়ল বাইরে, মাটিতে।

তীব্র হর্ন বাজাল একটা ছুটন্ত কার, কোনমতে পাশ কাটিয়ে ভবঘুরেকে ধাক্কা দেয়া এড়াল। কেয়ারই করল না লোকটা।ছুটছে প্রাণপণে।

প্রায় লাফিয়ে এসে রাস্তায় উঠল মুসা, ছুটল।চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিশ, রিভলভারের মুখ আকাশের দিকে করে বাতাসে গুলি ছুঁড়ল।রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছে ভবঘুরে, ডানে ঘুরে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর থাকতে পারছি না, ফাদার! বলেই জানালার চৌকাঠে উঠে বসল কিশোর।লাফিয়ে নামল মাটিতে।ছুটল।তাকে অনুসরণ করছে রবিন।

এই যে, ছেলেরা! চেঁচিয়ে উঠল একজন পুলিশ, যে হকারের ছদ্মবেশ নিয়েছে, পথ থেকে সর! গোলাগুলি চলতে পারে!

শাঁ করে মোড় নিল একটা স্কোয়াড কার, টায়ারের কর্কশ শব্দ উঠল।কাছে চলে এল নিমেষে।জানালা দিয়ে মুখ বের করে আছে একজন পুলিশ।চেঁচিয়ে তাকে বলল সার্জেন্ট হেগান, সামনের মোড়ের দিকে গেছে!

দাঁড়ান! পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর।

ফিরে তাকাল সার্জেন্ট।গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়েছে।কিশোরের গলা শুনে দাঁড়িয়ে গেছে মুসাও।

কি হল? জিজ্ঞেস করল হেগান।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই, কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর।হাঁপাচ্ছে।কোথায় গেছে লোকটা, জানি আমি।লুকোতে চেষ্টা করবে না সে।চমৎকার অ্যালিবাই রয়েছে।

ও, তুমিই সেই ছেলে, যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ মিস্টার অলিভার, বলল সার্জেন্ট।তো, খোকা, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?

এখান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে।হ্যামলিন ক্লিনিকে।

স্কোয়াড কারের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সবই শুনল পুলিশ অফিসার।ডাকল, এস, গাড়িতে ওঠ।

পেছনের সিটে উঠে বসল তিন গোয়েন্দা।দেখতে দেখতে ক্লিনিকের গেটে পৌঁছে গেল গাড়ি।ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুপাশের দরজা।লাফিয়ে নেমে এল আরোহীরা।

রিসেপশন রুমে ঢুকে পড়ল ওরা হুড়মুড় করে।চোখ তুলে তাকাল।রিসেপশনিস্ট।কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেই চুপ হয়ে গেল।তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না।পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল বারান্দায়।

দুপদাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় উঠে এল ওরা! থমকে দাঁড়াল ডিউটি-নার্স।কাকে চাই? রিসেপশনে আমাকে কিছু বলল না তো!

দরকার নেই, বলল কিশোর।ছুটে গেল বারান্দা দিয়ে।তার পেছনে আর সবাই।হাঁ করে চেয়ে রইল নার্স।

দরজা বন্ধ জ্যাকবসের কেবিনের।ধাক্কা দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।কিশোর।

বিছানায় শুয়ে আছে জ্যাকবস।গলার কাছে টেনে দিয়েছে কম্বলটা।বিছানার উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে রাখা টেলিভিশনটা অন করা।

চোখ ফিরিয়ে তাকাল জ্যাকস।কি ব্যাপার?

প্যাকেটা কোথায়, মিস্টার জ্যাকবস? জিজ্ঞেস করল কিশোর।আলমারিতে নাকি কম্বলের তলায় নিয়ে শুয়ে আছেন?

উঠে বসল জ্যাকবস।মুখ লাল হয়ে গেছে, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে যেন।গা থেকে খসে পড়ে গেল কম্বল।চেক চেক একটা জ্যাকেট গায়ে, নিচে শার্ট নেই।

টান দিয়ে আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল কিশোর। ওপরের তাকেই পাওয়া। গেল প্যাকেটটা।খালা হয়নি এখনও।

গুঙিয়ে উঠল জ্যাকবস।

প্যাকেটটা ধরেছেন, বলল কিশোর।আপনার হাতে মলম লেগে গেছে।শিগগিরই ভরে যাবে কালো কালো দাগে।

চোখের সামনে হাত নিয়ে এল জ্যাকবস।

সামনে বাড়ল সার্জেন্ট হেগান।উকিলকে ডাকবেন নাকি?

আর উকিল ডেকে কি করব! দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যাকবস।

কিশোরের দিকে ফিরল সার্জেন্ট।অলিভার বললেন, তোমরা খুব চালাক! ঠিকই বলেছেন। সুন্দর অ্যালিবাই! প্রাইভেট হসপিটাল! কে ভাবতে পেরেছিল...

নিজের ফ্ল্যাটে নিজেই আগুন লাগিয়েছেন জ্যাকবস, বলল কিশোর। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্যে।তিনি জানেন, এ-সময়ে এ-হাসপাতালে রোগীর ভিড় থাকে না।শহরের বেশির ভাগ লোকই বাইরে চলে গেছে বড় দিনের ছুটিতে। ফলে ডিউটি-নার্স আর ডাক্তারের সংখ্যাও কমিয়ে দেয়া হয়।ওদের চোখ এড়িয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে বেরিয়ে যাওয়া কিছু না। তাছাড়া হাসপাতালটা বাসার কাছে। হাসপাতালের পেছনে ঝাড়দার ঢোকার পথ দিয়ে সহজেই ঢোকা কিংবা বেরোনও যায়।আসলে কিন্তু খুব বেশি আহত হননি জ্যাকস।যা হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করেছেন ভান।গাঁটের পয়সা খরচ করে কেউ যদি প্রাইভেট হাসপাতালে আসতে চায়, ডাক্তারদের কি? তাই তাঁর এখানে আসার ব্যাপারে সেন্ট্রাল হাসপাতালের ডাক্তাররাও আপত্তি করেননি।তাই না, মিস্টার জ্যাকবস?

.

২০.

শহরের বাইরে গিয়েছিলেন চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। জানুয়ারির মাঝামাঝি ফিরে এলেন।

অফিসে, বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন চিত্রপরিচালক। এ পাশে বসেছে তিন গোয়েন্দা। গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা রিপোর্ট পড়ছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। দীর্ঘক্ষণ পরে মুখ তুললেন। চমৎকার! রবিন লিখেছেও খুঁটিয়ে। নিজের ছায়াদেহ নিয়ে ঘুরতে বেরোনো! সাংঘাতিক ব্যাপার! বড় বড় ভূতও ওস্তাদ মানবে টমি গিলবার্টকে!

ওর এই বিশেষ ক্ষমতার কথা সে একবারও স্বীকার করেনি, বলল রবিন।বলে, স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রফেসর লিসা রোজারের কাছে সব শুনে এসেছি।কিভাবে স্বপ্ন দেখে টমি, জানি আমরা।

হ্যাঁ, কিশোরের দিকে ফিরলেন চিত্রপরিচালক।কিশোর, কি করে জানলে, জ্যাকবসই চোর?

কিছু যোগ কিছু বিয়োগ করে, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর।প্রথমেই সন্দেহ করলাম, চোর মিস্টার অলিভারের ভাড়াটেদের কেউ হবে।সে জানে গির্জার চাবি রেকটরির কোথায় রাখা হয়।মিস ল্যাটনিনা আর মিসেস।ডেনভারের স্বভাবচরিত্র জানাও তাদের কাছাকাছি যারা থাকে, তাদের পক্ষেই সহজ।জানে, ওই দুজনকে সরাতে পারলে পুলটা নিরাপদ। টমিকে সন্দেহ করলাম। পরে বুঝল, সে চোর নয়। চুরিটা যখন হয়, সে ঘুমিয়েছিল তার ঘরে।একই সময় দুজায়গায় থাকার ক্ষমতা অবশ্য তার আছে।তবে বড় জোর দেখতে এবং শুনতে পারে ছায়া শরীরে যখন থাকে।কোন জিনিস নাড়াচাড়া করতে পারে না।তার মানে ছায়া শরীর নিয়ে কারও ঘরে ঢুকে কোন জিনিস চুরি করতে পারে না।সে।বাদ দিলাম তাকে সন্দেহ থেকে।বব বারোজকেও সহজেই বাদ দেয়া গেল।সে ছিলই না চুরির রাতে প্যাসিও প্লেসে।পুরুষ ভাড়াটেদের মাঝে বাকি রইল।ব্রায়ান এনড্রু, আর জ্যাকবস।চুরির সময় ও-বাড়িতে দুজনের কাউকেই দেখা যায়নি।দুজনেই শুনেছে, মিসেস ডেনভারের পুলের পানি পরিষ্কার করার কথা।পরে মনে পড়েছে আমার, কথাটা শুনে একটু যেন চমকে উঠেছিল জ্যাকস।এনড্রুর কোন ভাবান্তরই হয়নি।তাছাড়া সে রাতে গাড়ি নিয়ে কোথাও বেরিয়েছিল।জ্যাকবস।

নিশ্চয় বোমার সরঞ্জাম কিনতে? বলে উঠলেন চিত্রপরিচালক।এসব জিনিস বাড়িতে রাখে না লোকে হরহামেশা।

অতি সাধারণ কয়েকটা কেমিক্যাল কিনে নিয়ে এল জ্যাকবস, আবার বলল কিশোর। সাধারণ একটা বোমা বানিয়ে বসিয়ে রাখল মিসেস ডেনভারের গাড়ির ইঞ্জিনে।মোটেই মারাত্মক ছিল না বোমাটা।প্রচণ্ড শব্দ আর ধোয়া বেরোনর জন্যে তৈরি, ক্ষতি সামান্যই করে।ভয় দেখিয়ে মহিলাকে তাড়াতে চেয়েছে আসলে।জ্যাকবস।যাতে অন্তত দুটো দিন পুলটা পরিষ্কার করাতে না পারে ম্যানেজার।রহস্যটা সমাধান প্রায় করে এনেছিলাম, কিন্তু

ঘরে আগুন লাগিয়ে একটা গোলকধাঁধায় ফেলে দিল আমাকে জ্যাকবস।আগুন লাগাটা দুর্ঘটনা নয়, তখনই বুঝেছি।খটকা লাগল।সিগারেটের ব্যাপারে খুবই সতর্ক জ্যাকবস, সঙ্গে অ্যাশট্রে নিয়ে ঘোরে, ছাই থেকে আগুন লেগে যাবার ভয়ে।ধরে নিলাম, এনড্রু চোর। আগুন।লাগিয়ে জ্যাকবসকেও সরাতে চয়েছে।কিন্তু প্রশ্ন জাগল মনে, কেন সরাতে যাবে? পুলের সঙ্গে জ্যাকবসের কোন সম্পর্ক নেই।কোন যুক্তিই খুঁজে পেলাম না।দ্বিধায় পড়ে গেলাম।সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল, যখন চিঠি নিয়ে এল পিয়ন।খামে উইলশায়ার পোস্ট অফিসের ছাপ।তাছাড়া সময় ঠিক করেছে বিকেল পাঁচটা, বেড়ালকে খাবার খাওয়ার সময় তখন এনড্রুর।কিছুতেই এই সময়ে টাকা আনতে যাবে না সে।শিওর হয়ে গেলাম, জ্যাকবসই চোর।

হাসলেন চিত্রপরিচালক।ঠিক।পাঁচটায় কিছুতেই অনুপস্থিত থাকবে না এনড্রু।মোটেল থেকে এসেও বেড়ালদেরকে খাওয়ায়।একবার গরহাজিরা দিলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে বেড়ালের পাল।বেড়াল-মানবের অনুপস্থিতি জানিয়ে দেবে।কিছুতেই এই ঝুঁকি নিত না এনড্রু হলে।ঠিকই ভেবেছ তুমি।ভুরু কোচকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।কিন্তু চুরি করতে গেল কেন জ্যাকবস? টাকার এতই টান পড়েছিল?

টান পড়েছিল, পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে জ্যাকবস।তার ব্যবসা খুব।মন্দা যাচ্ছিল। অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল ব্যাংকে।এমনিতেই টাকা পরিশোধ করতে না পারার দায়ে জেলে যেতে হত তাকে।কাজেই নিয়েছে ঝুঁকি।

সেই পুরানো প্রবাদ! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চিত্রপরিচালক। অভাবে স্বভাব নষ্ট! নইলে জ্যাকবসের মত লোক একাজ করতে যেত না! ভীষণ চাপে পড়েই কাজটা করে ফেলেছে বেচারা!

আয় যখন ভাল ছিল, ভাগ্নের পড়ার খরচের জন্যে, তার নামে ব্যাংকে অনেক টাকা জমা করেছে জ্যাকবস মাসে মাসে, বলল কিশোর।দশ হাজার ডলারের বেশি হবে।ব্যাংকের ঋণ শোধ করে দিয়েছে বব তার টাকা থেকে।কিন্তু ব্যাপারটা এখন আর শুধু তার হাতে নেই।আরও কয়েকটা কেস ঝুলছে জ্যাকবসের মাথায়।পল মিনকে পিটিয়ে বেহুশ করেছে, মিস ল্যাটনিনাকে বিষ খাইয়েছে, মিসেস ডেনভারের গাড়িতে বোমা ফাটিয়েছে।জানালা ভেঙে অন্যের ঘরে ঢুকে জিনিস চুরি করেছে, সেটা আবার ফেরত দেয়ার কথা বলে দশ হাজার ডলার দাবি করেছে।মালিকের কাছে।এগুলো মস্ত অপরাধ।

হু! মাথা ঝোঁকালেন চিত্রপরিচালক।আচ্ছা, কবে, কে মিস্টার।অলিভারের কাছে নিয়ে আসবে, জ্যাকবস জানল কিভাবে?

টমি বলেছে, বলল কিশোর।সেদিন সকালেই মিস্টার অলিভারের ঘরে ঢুকেছিল সে।ফোনে তাকে কথা বলতে শুনেছে মিকো ইলিয়টের সঙ্গে।মিসেস ডেনভার জ্যাকবসকে বলেছিল, কুকুর আনার কথা।সে ব্যাপারেই টমির সঙ্গে কথা বলছিল জ্যাকবস।এক পর্যায়ে টমি বলে বসেছে, ওটা জ্যান্ত কুকুর নয়, ক্রিস্টালের মূর্তি।অনেক দাম।কথায় কথায় তার কাছ

থেকে খবর বের করে নিয়েছে স্টকব্রোকার।তারপর মিউজিয়মে চলে গেছে।খোঁজ নিয়ে জেনেছে, মূর্তিটা কে বানিয়েছে, কেমন মূল্যবান।সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জেনে এসেছে শো গ্যালারি থেকে।মনে মনে প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে।মিকো ইলিয়টকে অনুসরণ করে এসেছে গ্যালারি থেকেই।জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে মিকো ঘরে থাকতেই...

বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল একেবারে! মন্তব্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

হ্যাঁ।তবে ওর কপাল খারাপ, রাস্তার মোড়েই পুলিশ ছিল।তাড়া খেয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকতে পারত, কিন্তু তাহলে ধরা পড়ে যেত।গির্জাটাই নিরাপদ জায়গা মনে করেছে।ঠিকই মনে করেছিল।পুলিশকে তো ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু সে জানত না, সে-সময়ে মিস্টার অলিভারের বাড়িতে হাজির তিন গোয়েন্দা, বুক ফোলাল মুসা।মুখে হাসি।

আসলেই তার কপাল খারাপ, বলল কিশোর।ফাঁকি তো প্রায় দিয়ে ফেলেছিল।কিন্তু সে কি আর জানত, পুলে যখন মূর্তিটা ছাড়ছে, কাছেই ছায়া। শরীরে দাঁড়িয়েছিল টমি গিলবার্ট?

টমি আছে এখনও ও-বাড়িতে? জানতে চাইলেন পরিচালক।

না, বলল মুসা। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন তাঁকে, মিস্টার অলিভার। কাছেপিঠে ওরকম একটা প্রেতসাধককে রেখে শান্তিতে থাকতে পারবেন না, বুঝে ফেলেছেন।পশ্চিম লস অ্যাঞ্জেলেসের কোথায় একটা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এখন সে।

ওখান থেকেও তো আসতে পারে তার ছায়া শরীর?

পনেরো দিন হয়ে গেল, জবাব দিল রবিন।এর মাঝে একবারও আসেনি, জানিয়েছেন মিস্টার অলিভার।মিসেস ডেনভারকেও বিদেয় করে দিয়েছেন। ভাড়াটেদের শান্তি নষ্ট করবে তার ম্যানেজার, এটা কিছুতেই চান না।নতুন ম্যানেজার রেখেছেন।কমবয়েসী একটা মেয়ে।কারও সাতে ও থাকে না পাঁচেও না।কাজ যা করার করে, বাকি সময় ঘরে বসে নিজের কাজ করে, বই পড়ে, কিংবা টিভি দেখে।যেচে পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলতেও যায় না।

যাক, সব সমস্যারই সমাধান হল, বললেন পরিচালক।একটা ছাড়া।বৃদ্ধ ফাদারের ভূত...।

ওটা কারও ভূত না, বাধা দিয়ে বলল কিশোর। জ্যাকবসই ফাদারের ছদ্মবেশে গিয়েছিল...

জানি, হাত তুললেন পরিচালক।আমি সেকথা বলছি না।বলছি, গুজব আছে, গির্জায় ফাদারের ভূত দেখা যায়।যা রটে, তা কিছুটা তো বটে! কেন জানি।মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা আছে! কি দেখল, কাকে দেখল তামারা, ব্রাইস? সবই কি তার কল্পনা?

হ্যাঁ, সেটা একটা রহস্য, মাথা ঝোকাল কিশোর।সময় পেলে খোঁজ করে।দেখব ভালমত। হয়ত রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে পারব।..তো আজ আসি, স্যার।

এস, বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।পারলে শিগগিরই ফাদারের ভূতের সন্ধান করতে যেও। আর, এর মাঝে নতুন কোন রহস্যের খোঁজ পেলে জানাব।নাউ, থ্যাংক ইউ, মাই বয়েজ!